শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস



আল্লামা মুহাম্মাদ রেজা আল-মুজাফফর

শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস

আল্লামা মুহাম্মাদ রেজা আল-মুজাফফার

ভাষান্তরে ঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন তালুকদার

সম্পাদনা ঃ শেখ মোঃ শহীদুজ্জামান



শিয়াদের মৌলিক বিশ্বাস

মূল শিরোনাম ঃ আকাঈদ আল-ইমামীয়াহ
মূল লেখক ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ রেজা আল-মুজাফফার
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন তালুকদার
সম্পাদনা ঃ শেখ মোঃ শহীদুজ্জামান
প্রকাশক ঃ 'মারকাজ-এ জাহানী-এ উলুমে ইসলামী'
প্রচ্ছদ ঃ আলী নেওয়াজ খান
কম্পোজ ঃ কম্পিউটার প্রান্ত ট্রেনিং সেন্টার,
কলেজ রোড, দাকোপ, খুলনা।
মুদ্রণে ঃ কাজল প্রিন্টিং এন্ড বুক সেলার
২/১৩, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী' ২০০৬ ইং
১০ই মহররম' ১৪২৭ হিঃ
মূল্য ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

Shiader Moulik Biswas

Written by : Allamah Muhammad Rida Al-Muzaffar
Translated by : Md. Main Uddin Talukder
Edited by : Sheikh Md. Shahiduzzaman
Published by : 'Markaj-e Jahani-e Ulum-e Islami'
Price : Tk. 50.00 (Fifty) only

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ

১. অনুসন্ধান ও জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ০৬
২. দ্বীনের শাখাগত বিষয়সমূহের (ফুরুয়ে দ্বীন) ক্ষেত্রে অন্যের অনুসরণ (তাকলীদ) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ০৮
৩. ইজতিহাদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ০৯
৪. মুজতাহিদের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১০

পর্ব -১ ঃ তাওহীদ

৫. মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১১
৬. তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১২
৭. মহান আল্লাহর গুণাবলী (সিফাত) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১৩
৮. আল্লাহর ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১৫
৯. মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১৭
১০. ক্বাজা ও ক্বাদার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১৮
১১. বাদা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ২০
১২. দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ২২

পর্ব -২ ঃ নবুওয়াত

১৩. নবুওয়াত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ২৪
১৪. নবুওয়াত হলো মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক দান (লুত্ফ) / ২৫
১৫. নবীগণের মোজেযা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ২৭
১৬. নবীগণের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ২৯
১৭. নবীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৩০
১৮. পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৩১
১৯. ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৩১
২০. ইসলামের মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৩৪
২১. পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৩৫
২২. ইসলাম ও তৎপূর্ববর্তী ঐশী ধর্মসমূহকে প্রতিপাদন করার উপায় / ৩৬

পর্ব -৩ ঃ ইমামত

২৩. ইমামত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৪১
২৪. ইমামের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৪৩
২৫. ইমামের জ্ঞান ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৪৩
২৬. ইমামগণের (আঃ) আনুগত্য সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৪৫
২৭. আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৪৭
২৮. ইমামগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস / ৪৯
২৯. ইমাম নিয়োগ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৫০
৩০. ইমামগণের (আঃ) সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৫১
৩১. ইমাম মাহদীর (আঃ) প্রতি আমাদের বিশ্বাস / ৫৩
৩২. রাজআত (পুনরাবর্তন) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৫৬
৩৩. তাকিয়্যা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৬০

পর্ব -৪ ঃ মহানবীর (সাঃ) আহলে বাইত থেকে শিয়াদের জন্য শিক্ষা

ভূমিকা / ৬৩
৩৪. দোয়া সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৬৪
৩৫. সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার দোয়াসমূহের মূল বিষয়বস্তু / ৭০
৩৬. কবর যিয়ারত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৭৯
৩৭. মহানবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতের (আঃ) নিকট তাশাইয়্যুর অর্থ / ৮৫
৩৮. অত্যাচার ও অবিচার থেকে দূরে থাকা / ৮৯
৩৯. অত্যাচারীদের সাথে সহযোগিতা না করা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৯১
৪০. অত্যাচারী শাসকদের প্রশাসনে কাজ না নেয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস / ৯৪
৪১. ইসলামী ঐক্যের আহবান সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ৯৫
৪২. মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১০০

পর্ব -৫ ঃ কিয়ামত (মাআদ)

৪৩. পুনরুত্থান বা মাআদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১০৭
৪৪. দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস / ১০৮

ভূমিকা

অনুসন্ধান, জ্ঞান, ইজতিহাদ ও তাকলীদ

১. অনুসন্ধান ও জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন এবং দিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তি (আকল)। আর এ কারণেই তিনি আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং গভীর অনুসন্ধান ও অনুধাবন করতে আদেশ দিয়েছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন সমগ্র সৃষ্টি নিদর্শন এবং স্বয়ং আমাদের সৃষ্টিতেও তাঁর প্রজ্ঞা ও পরাক্রমকে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন-

> **"আমরা বিশ্বজগতে ও তাদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাতে থাকব ফলে তাদের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি (মহান আল্লাহ) সত্য।"** (সুরা হা-মীম সেজদাহ - ৫৩)

যারা তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

> **"তারা বলে, আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত পথই অনুসরণ করব এমনকি তাদের পূর্ব পুরুষগণের কোন জ্ঞান না থাকলেও?"** (সুরা বাকারা - ১৭০)

অনুরূপ, মহান আল্লাহ তাদেরকেও ভর্ৎসনা করেন যারা কেবলমাত্র তাদের অমূলক ধারণার অনুসরণ করে। পবিত্র কোরআনে তিনি বলেন-

> **"তারা তাদের (অমূলক) ধারণা ব্যতীত অন্য কিছুরই অনুসরণ করে না।"** (সুরা আনআম - ১১৬)

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদেরকে বাধ্য করে সৃষ্টিকে অনুধাবন করতে ও তার সৃষ্টি কর্তাকে জানতে। তদ্রুপ কারো নবুওয়াতেরদাবী ও তার কর্তৃক প্রদর্শিত মোজেযার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে

ও তার দাবীর সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে বাধ্য করে। এ বিচার বিশ্লেষণ ব্যতীত কাউকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য সঠিক নয় যদিও বা তার জ্ঞান ও মর্যাদা অভূতপূর্ব হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে আমাদেরকে চিন্তা করতে ও জ্ঞানার্জন করতে আহবান জানানো হয়েছে। আর পবিত্র কোরআনের এ আহবানের কারণ হলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ফেতরাতগত (সৃষ্টি প্রকরণগত) স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা যার উপর অনুসরণ করে প্রত্যেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সত্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে (সৃষ্টিগতভাবে) আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই পবিত্র কোরআন আমাদেরকে সতর্ক করছে এবং আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তির উত্তরাধিকারগত চাহিদার দিকে পরিচালিত করছে।

অতএব এটা সঠিক নয় যে, মানুষ স্বীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অজ্ঞ থেকে যাবে কিংবা কোন শিক্ষক বা অন্যকোন ব্যক্তির অনুসরণ করবে। বরং তার জন্য আবশ্যক হলো ফিতরাতগত বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে গভীর অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ করে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা। ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোকে উসূলে দ্বীন [১] বলে নামকরণ করা হয় যে গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো -

১। তাওহীদ বা একত্ববাদ
২। নবুওয়াত বা রিসালাত
৩। ইমামত
৪। মা'য়াদ বা কিয়ামত

যে কেউ এসকল মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার পূর্ব পুরুষ বা অন্য কাউকে অন্ধ অনুসরণ করবে সে নিশ্চিত রূপে মিথ্যা দ্বারা আবিষ্ট হবে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে। আর এ ব্যাপারে কখনোই কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

১- এ পুস্তিকায় যে সকল বিষয় সমূহে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তার সবগুলোই মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত নয়। ভাগ্যলিপি, রাজআতের মত এমন অনেক বিশ্বাস রয়েছে যে গুলোতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব নয় বা এ গুলোতে বিশেষ অনুসন্ধানেরও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এগুলোর সত্যতার জন্য নবী ও ইমামগণের (আঃ) উক্তিই যথেষ্ট। আমাদের এ ধরনের অনেক বিশ্বাস আছে যেগুলো আমাদের ইমামগণের (আঃ) নিকট থেকে নিশ্চিতরূপে বর্ণিত হয়েছে।

মৌলিক বিশ্বাসসমূহ দুটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল-

প্রথমত ঃ মৌলিক বিশ্বাসগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা আবশ্যক এবং এক্ষেত্রে অন্য কাউকে অনুসরণ করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ এ বিশ্বাসগুলো অর্জন করা শরীয়তগতভাবে আবশ্যক হওয়ার পূর্বেই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আবশ্যক হয়ে পড়ে। (অর্থাৎ শুধু ধর্মীয় উৎস থেকে আমরা এগুলো অর্জন করবো না যদিও ধর্মে এগুলো নিশ্চিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। বরং আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার মাধ্যমে তা অর্জন করবো।) আর মৌলিক বিশ্বাস গুলোর ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন, চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুধাবন ব্যতীত বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আবশ্যকীয় হওয়ার কোন অর্থই থাকে না।

২. দ্বীনের শাখাগত বিষয়সমূহের (ফুরুয়ে দ্বীন) ক্ষেত্রে অন্যের অনুসরণ (তাকলীদ) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

দ্বীনের শাখাগত বিষয়সমূহ বা ফুরুয়ে দ্বীন বলতে বুঝায় কার্যগত ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানসমূহকে। এগুলোর ক্ষেত্রে (সবার জন্য) বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা ও গবেষণা আবশ্যক নয়। বরং সেক্ষেত্রে আবশ্যক হলো নিম্নলিখিত পন্থাত্রয়ের মধ্যে একটিকে অবলম্বন করা (যদি না নামায ও রোজার মত দ্বীনের সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত কোন বিষয় হয়)।

(ক) যোগ্যতা থাকলে গবেষণা (ইজতিহাদ) করতে হবে এবং আহকামের দলিলগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে।

খ) যদি সক্ষম হয় তবে তার কাজকর্মের ব্যাপারে সাবধানতা (এহতিয়াত) অবলম্বন করতে হবে।

গ) অনুমোদিত বা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী এমন কাউকে অনুসরণ করতে হবে যিনি জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ (যিনি নিজেকে পাপ কর্ম থেকে বিরত রাখেন, দ্বীনের রক্ষক, স্বীয় কামনা বাসনার অনুসারী নন বরং তার প্রভুর আদেশ নিষেধ মেনে চলেন)।

অতএব যদি কেউ মুজতাহিদ বা গবেষক না হয়ে থাকে, কিংবা সাবধানতা বা এহতিয়াত অবলম্বন না করে, অথবা নির্দিষ্ট শর্তের বা যোগ্যতার (প্রাগুক্ত) অধিকারী কাউকে অনুসরণ না করে তবে তার সমস্ত

এবাদতই বাতিল হয়ে যাবে এবং তা থেকে কোন কিছুই কবুল হবে না, এমনকি সারাজীবন নামায, রোজা পালন করলেও। তবে তাকলীদ (বা পূর্ব বর্ণিত কোন ব্যক্তির অনুসরণ) করলে পূর্বে কৃত আমলসমূহ এ শর্তে কবুল হবে যে, সেগুলো অনুসৃত মুজতাহিদের মতানুসারে ও আল্লাহর তুষ্টির জন্য করা হয়েছে।

৩. ইজতিহাদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ফুরুয়ে দ্বীনের আহকামের ক্ষেত্রে ইমামের আত্মগোপনের সময়কালে ইজতিহাদ করা সমস্ত মুসলমানের জন্য ওয়াজীবে কেফায়া। অর্থাৎ এটা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যেই ওয়াজীব। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ একজন এ যোগ্যতা অর্জন করে তবে অন্যরা এ দায়ভার থেকে অব্যাহতি পায়। যদি কেউ ইজতিহাদের দ্বারে পৌঁছে এবং সকল মনোনীত শর্ত বা যোগ্যতা অর্জন করে তবে ফুরুয়ে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ (বা তার তাকলীদ) করাই অন্যদের জন্য যথেষ্ট।

সকল যুগে মুসলমান মাত্রই স্বয়ং বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যখন কিছু ব্যক্তি ইজতিহাদের দ্বারে পৌছার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করে ও মুজতাহিদ হয় এবং যখন তারা অনুসরণীয় হওয়ার মত সকল শর্ত পূরণ করে, তখন ফুরুয়ে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুসরণ করা সে সকল ব্যক্তির জন্য আবশ্যক যারা ব্যক্তিগতভাবে ইজতিহাদ করতে চান না। ইজতিহাদের দ্বারে পৌঁছানো কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। কোন সমাজে ইজতিহাদের শর্তসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হলে সকলের উপর ইজতিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তবে যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ইজতিহাদ করা সম্ভব নয় সেহেতু তাদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে এ মর্যাদায় পৌঁছার জন্য তৈরী করতে হবে। কিন্তু মৃত মুজতাহিদের তাকলীদ করা তাদের জন্য বৈধ হবে না।

ইজতিহাদ হলো শরীয়তের বিভিন্ন দলিলের উপর বিচার বিশ্লেষণ করে মহানবী (সাঃ) ফুরুয়ে দ্বীনের ক্ষেত্রে যে আহকাম এনেছেন সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। মহানবীর (সাঃ) এ আহকাম কাল ও স্থানের পরিবর্তনে কখনোই পরিবর্তিত হবে না। [মোহাম্মদ (সাঃ) এর হালাল কিয়ামত পর্যন্ত হালাল, তাঁর হারাম কিয়ামত পর্যন্ত হারাম]। আর শরীয়তের

দলিলগুলোর উৎস হলো- পবিত্র কোরআন, রাসুলের (সাঃ) ও ইমামগণের (আঃ) সুন্নাত, ইজমা (ফকীহগণের মতৈক্য) এবং বুদ্ধিবৃত্তি (আকল), তবে যেরূপ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহকারে উসুলে ফিকাহ শাস্ত্রে এবিষয় সমূহ বর্ণিত হয়েছে। ইজতিহাদের এ মর্যাদা লাভের জন্য এক দীর্ঘ সময়কালের অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন এবং এটা কখনোই অর্জিত হবে না যদি না কেউ এক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হয়।

৪. মুজতাহিদের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল ইঙ্গিত শর্তপূরণকারী মুজতাহিদ হলেন ইমামের (আঃ) অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধি। সুতরাং তিনি (মুজতাহিদ) হলেন সমস্ত মুসলিম জনতার পরিচালক এবং তিনি ইমামদের (আঃ) সমস্ত দায়িত্ব (যেমন-মীমাংসা, বিচার কার্য, প্রশাসনিক কর্মকান্ড ইত্যাদি) পালন করে থাকেন। এ কারণে আহলে বাইতের ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন-

> **"মুজতাহিদকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো ইমামকে (আঃ) প্রত্যাখ্যান করা। আর ইমামকে (আঃ) প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা। আর এটা অংশীবাদ ও শিরকের নামান্তর বৈ কিছু নয়।"**

অতএব, সকল মনোনীত যোগ্যতার অধিকারী মুজতাহিদ কেবলমাত্র ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রেই ক্ষমতাধর নন বরং তাঁর সার্বজনীন বেলায়াত (অভিভাবকত্ব) বিদ্যমান। সুতরাং হুকুম, মীমাংসা, বিচার ইত্যাদি তাঁর জন্য নির্ধারিত যে কোন আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে তাঁর নিকট ব্যতীত অন্য কারো শরনাপন্ন হওয়া বৈধ নয়, যদি না তাঁর অনুমতি থাকে। তদ্রূপ তাঁর আদেশ ব্যতীত শাস্তি প্রদান বৈধ নয়। ইমামের (আঃ) জন্য নির্ধারিত সম্পদের ক্ষেত্রেও মুজতাহিদের শরনাপন্ন হতে হবে।

ইমামের (আঃ) অনুপস্থিতিকালীন সময়ে ইমাম (আঃ) তাকে এ সকল দায়িত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। আর এ জন্যই তাঁকে বলা হয় নায়েবে ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি।

পর্ব -১

তাওহীদ

৫. মহান আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, কোন কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি অনাদি ও অনন্ত, যার কোন শুরু বা শেষ নেই, তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, ন্যায়-পরায়ণ, অস্তিত্বময়, সর্বদ্রষ্টা। সৃষ্টির কোন গুণ দিয়ে তাঁকে গুনান্বিত করা যায় না। তাঁর কোন দেহ নেই, কোন অবয়ব নেই, তিনি বস্তুসত্তা (জাওহার বা Substance) নন এবং উপজাত (আরাজ বা Phenomena) নন, তিনি হাল্কা নন ও ভারী নন, তিনি স্থিতিশীল নন ও গতিশীল নন, তাঁর কোন স্থান নেই, কোন কাল নেই, কেউই তাঁর দিকে নির্দেশ করতে পারে না, যেহেতু কোন কিছুই তাঁর মত নয়, কিছুই তাঁর সমান নয়, তাঁর কোন বিপরীত নেই, তাঁর কোন স্ত্রী নেই, কোন কিছুই তাঁর তুল্য নয়। দৃষ্টিগুলো তাঁকে নিবদ্ধ করতে পারে না বরং তিনিই দৃষ্টিগুলোকে নিবদ্ধ করেন। যারা আল্লাহর রূপ, মুখাবয়ব, হাত ও চোখ ইত্যাদি আছে বলে তুলনা করেন অথবা আকাশ থেকে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেন কিংবা বেহেশতবাসীকে তিনি চন্দ্ররূপে দর্শন দিবেন ইত্যাদি বলে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে কুফরি করেন। কারণ সর্বপ্রকার ঘাটতি থেকে পবিত্র আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। আমরা যা কিছুই ধারণা করি না কেন সবই আমাদের মত সৃষ্টি। ইমাম বাকের (আঃ) বলেন-

> **"তিনি বিজ্ঞদের ব্যাখ্যার উর্ধে এবং তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের নাগালের বাইরে।"**

এরূপ সে ব্যক্তিও আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে পরিগণিত হবে যে বলে- আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তাঁর সৃষ্টিকে দর্শন দিবেন। যদিও মুখে তারা বলে থাকে যে, আল্লাহর দেহ নাই। এ ধরনের দাবী করার কারণ হলো তারা কোরআন এবং হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করেছে।

তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্বীকার করেছে। সত্যিই তারা তাদের অজ্ঞতার আড়ালে কোরআনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক দলিল, ভাষাতত্ত্ব ও ব্যকরণের সাহায্য গ্রহণ করতঃ বাহ্যিক অবয়ব ভেদ করে এর গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেনি।

৬. তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা মহান আল্লাহর সর্বময় একত্ববাদে বিশ্বাস করি। (প্রথমতঃ) তাঁর সত্তাগত (জাতগত) একত্ব থাকা আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস তিনি সত্তাগতভাবে এক এবং অত্যাবশ্যকীয় অস্তিত্ব। তেমনি (দ্বিতীয়তঃ) তাঁর গুণগত একত্ববাদের আবশ্যকতা রয়েছে। এ কারণে আমাদের বিশ্বাস মতে তাঁর গুণ, তাঁর সত্তা ভিন্ন কিছু নয় যার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর সত্তাগত গুণের ক্ষেত্রেও তিনি অতুলনীয়। যেমন- তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার তুলনা কিছুই হতে পারে না। অনুরূপ তাঁর সৃজনে বা সৃষ্টজীবের জীবিকা দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর যে কোন পুর্ণতার ক্ষেত্রেই কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়। এরূপভাবে আবশ্যক হলো (তৃতীয়তঃ) তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে একত্ববাদ। সুতরাং তিনি ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা বৈধ নয়। তদ্রূপ যে কোন প্রকার এবাদতে- হোক সে ফরয যেমন (নামায) কিংবা মুস্তাহাব যেমন দোয়া-ইত্যাদি কোন এবাদতের ক্ষেত্রেই তাঁর শরীক করা যাবে না। যদি কেউ এবাদতের ক্ষেত্রে তাঁকে ভিন্ন অন্য কাউকে শরীক করে তবে সে মুশরেক বলে পরিগণিত হবে। যেমন- কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এবাদত করল কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন কোন কিছুর নৈকট্য কামনা করল (যেমন- ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া করা বা লোক দেখানো ইবাদত)। ইসলামের দৃষ্টিতে সে মুশরেক এবং মূর্তি পূজা বা অন্য কোন কিছুর পূজার সাথে তার এবাদতের কোন পার্থক্য নেই। তবে কবর জিয়ারত করা ও শোক প্রকাশ বা মাতম করা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো এবাদতকরণ বলে পরিগণিত হবে না, যার অপবাদ দিয়ে কিছু লোক ইমামীয়া অর্থাৎ শিয়াদেরকে আক্রমণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা কবর যিয়ারতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু কিছু কল্যাণকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এগুলো হলো কিছু পন্থা। যেমন- অসুস্থকে দর্শন করে, জানাযাকে

সমাধিস্থ করে, দ্বীনের ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে ও দরিদ্র মুসলমানকে সাহায্য করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। সুতরাং অসুস্থের সাথে সাক্ষাৎ করা হলো স্বয়ং একটি কল্যাণব্রত যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। অসুস্থের দর্শন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত বলে পরিগনিত হওয়ার কারণ নয় বা এবাদতের ক্ষেত্রে শিরক নয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য কল্যাণব্রত যেমন- কবর যিয়ারত, শোক পালন, জানাযা সমাধিস্থকরণ এবং মুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করাও শিরক নয়।

যাহোক কবর যিয়ারত ও শোক পালন যে শরীয়তগতভাবে কল্যাণকর্ম তা ফিকাহশাস্ত্রে প্রমানিত হয়েছে। এখানে তা প্রমানের সুযোগ নেই। সংক্ষেপে এ ধরনের কর্ম সম্পাদন কোন ভাবেই শিরক নয় যা কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। ইমামদের (আঃ) মাযার যিয়ারতের ক্ষেত্রে তাঁদের এবাদত করার কোন উদ্দেশ্য এখানে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সেখানে উদ্দেশ্য থাকে ইমামগণের (আঃ) আদেশসমূহ পূনর্জীবিত করা। তাঁদেরকে নতুন করে স্মরণ করা এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান প্রদর্শন করা। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

> **"কেউ আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করলে তা তাদের অন্ত রের তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ।"** (সূরা হজ্জ - ৩২)

শরীয়তে এ কর্মগুলো মুস্তাহাব বলে পরিগণিত। সুতরাং মানুষ যদি এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তুষ্টি অর্জন করতে, তাঁর নৈকট্য লাভ করতে চায় তবে সে তার প্রতিদান তাঁর (আল্লাহর) নিকটই পাবে এবং সে অবশ্যই পুরস্কৃত হবে।

৭. মহান আল্লাহর গুণাবলী (সিফাত) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহর প্রকৃত ও হ্যাঁ-বোধক গুণগুলোকে পূর্ণতাগুণ (কামাল) ও সৌন্দর্যগুণ (জামাল) বলে নামকরণ করা হয়। যেমন- জ্ঞান (এলম), শক্তি (কুদরাত), ঐশ্বর্যবান (গনি), প্রত্যয় (এরাদা) ও চিরঞ্জীব (হায়াত)। এগুলোর সবই হলো তাঁর সত্তা, সত্ত্বাবহির্ভূত কিছু নয় এবং আল্লাহর সত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তাঁর শক্তিই তাঁর জীবন, আবার তাঁর জীবনই তাঁর শক্তি। যেদৃষ্টিতে

তিনি পরাক্রমশালী সেদৃষ্টিতেই তিনি চিরঞ্জীব, আবার যেদৃষ্টিতে তিনি চিরঞ্জীব সেদৃষ্টিতেই তিনি পরাক্রমশালী। তাঁর অস্তিত্ব আর গুণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং তাঁর অন্যান্য পূর্ণতাগুণগুলোও এরূপ।

হ্যাঁ, অর্থ ও ভাবার্থগত দিক থেকে এগুলোর (গুণ ও সত্তা) মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, তবে বাস্তব ও অস্তিত্বগত ক্ষেত্রে নয়। যদি অস্তিত্বগত দিক থেকে তারা পৃথক হয় তবে আবশ্যকীয় অস্তিত্বের (ওয়াজিবুল ওজুদ) একাধিক্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ ঐগুণগুলোও সত্তার ন্যায় অনাদি ও আবশ্যকীয় অস্তিত্ব। অথচ তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। সুতরাং গুণ ও সত্তার পৃথক হওয়ার ধারণা একত্ববাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। হ্যাঁ-বোধক সংযুক্তি (এজাফী) গুণগুলো যেমন- সৃজনগত (খালেকিয়াত), জীবিকাদানগত (রাজেকিয়াত), অগ্রতাগত (তাকাদ্দুম), কারণগত (ইল্লিয়াত) গুণগুলো একটি প্রকৃত (হাকীকী) ও একক গুণের অন্তর্ভূক্ত আর তা হলো তাঁর স্বনির্ভর অস্তিত্ব (কাইয়্যুম) হওয়া। যখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও ফলাফল থেকে বিবেচনা করা হয় তখন বর্ণিত গুণগুলো এ একটি গুণ থেকে উৎসারিত হয়। আবার না-বোধক গুণ যেগুলো সিফাতে জালাল (মহিমা গুণ) নামে পরিচিত, এগুলোর সবই একটি না-বোধক গুণের অন্তর্ভূক্ত। আর তা হলো তাঁর সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়াকে নাকচ করা। সুতরাং এ সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যানের অর্থ হলো, তাঁর শরীর নেই , তাঁর চেহারা নেই, তাঁর গতি নেই, স্থিতি নেই এবং তিনি ভারী নন, হালকা নন এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়াবলী। অর্থাৎ সমস্ত ঘাটতি থেকে মহান আল্লাহ মুক্ত। পুনরায় বলা যায় তাঁর সম্ভাব্য অস্তিত্ব হওয়াকে নাকচ করার প্রকৃত অর্থ হলো এটা প্রমান করা যে তিনি আবশ্যকীয় অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল ওজুদ) যা হ্যাঁ-বোধক পূর্ণতা গুণের অন্তর্ভূক্ত।

সুতরাং না-বোধক গুণগুলো অবশেষে হ্যাঁ-বোধক গুণেরই অন্তর্ভূক্ত হয়। অতএব মহান আল্লাহ সর্বদিক থেকেই এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর পবিত্র সত্তাকে খন্ড করা যায় না। তিনি অংশ সমাহার নন। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, কেউ কেউ বলে যে, হ্যাঁ-বোধক গুণগুলো যেন না-বোধক গুণের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, তাঁর গুণ হলো তারই সত্তা। ফলে তারা আল্লাহ সত্তাগতভাবে এক ও অদ্বিতীয়- এ বক্তব্যের নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে ধারণা করে যে, আল্লাহর হ্যাঁ-বোধক গুণ গুলো না-বোধক গুণের উপর নির্ভরশীল। এভাবে তারা এক মারাত্মক ভ্রান্ত পথে পতিত হয়েছেন। কারণ এভাবে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব- যে সত্তা সকল

প্রকার অপূর্ণতার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত সেই সত্তাকে- পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ফেলে। আর তার অর্থ দাড়ায় আল্লাহর অনস্তিত্বশীলতা।

অনুরূপ আশ্চর্যের বিষয় হলো তাদের কথা যারা বলে যে, আল্লাহর গুণগুলো হলো তাঁর অস্তিত্ববর্হিভূত। তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর গুণগুলো তাঁর সত্তার মতই প্রাচীন। ফলে তাঁর গুণগুলো তাঁর কর্মের অংশীদার। এভাবে তাদের বিশ্বাসে আল্লাহর (যিনি হলেন আবশ্যকীয় অস্তিত্ব) শরীক করে। আবার অন্যরা বলে আল্লাহ হলেন তাঁর গুণগুলোর সমাহার। কিন্তু মহান আল্লাহ এ ধরনের ধারণার ঊর্ধে। আমাদের মাওলা আমীরুল মুমিনীন আলী (আঃ) যিনি একত্ববাদীদের সর্দার বলেন-

> **"পূর্ণ ইখলাস হলো তাঁর উপর কোন বিশেষণ আরোপ না করা। কারণ প্রত্যেকটি বিশেষণই তাঁর বিশেষ্য থেকে পৃথক এবং প্রত্যেক বিশেষ্যই এর বিশেষণ থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং যে কেউ তাঁকে বিশেষায়িত করল সে যেন তাঁর সদৃশ বানালো, আর যে তাঁর সদৃশ বানালো সে তাঁর দ্বিতীয় বানালো, যে তাঁর দ্বিতীয় বানালো সে তাঁকে অংশ সমাহার বানালো, আর যে তাঁকে অংশ সমাহার বানালো সে তাঁকে ভুলভাবে গ্রহণ করলো।"**
> (নাহজুল বালাগা, খুতবা - ১)

৮. আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর একটি হ্যাঁ-বোধক পূর্ণতাগুণ হলো- তিনি সকল অন্যায়ের মোকাবেলায় ন্যায়পরায়ণ। তিনি ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত তাঁর সৃষ্টিকে লালন করেন না। তিনি ক্রোধভরে শাসন করেন না। তিনি তাঁর অনুগতকে পুরস্কৃত করেন। পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব প্রদান করেন না। তাদের পাপের ফলে প্রাপ্ত শাস্তির অধিক কোন শাস্তি তিনি তাদেরকে প্রদান করেন না।

আমরা বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ সুকর্ম সাধন থেকে বিরত থাকেন না। তিনি কখনো কুৎসিত কর্ম করেন না। কারণ, তিনি তাঁর জ্ঞানের কারণে সুকর্ম সাধন করতে সক্ষম ও কুৎসিত কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম। অসীম জ্ঞানের আলোকে সুকর্মের সুদিক ও কুৎসিত কর্মের কুদিক তাঁর নিকট স্পষ্ট। তিনি সুকর্ম করতেও সক্ষম আবার কুৎসিত কর্ম করতেও সক্ষম। যেহেতু কোন সুকর্মই তাঁর কাজের কোন ক্ষতি করতে পারে না তাই তাঁর তা

ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে কোন কুৎসিত কর্মই তাঁর প্রয়োজন হয় না। তাই তিনি তা করতে বাধ্য হন না। মহান আল্লাহ হলেন প্রজ্ঞাবান, সুতরাং তাঁর কর্মকান্ড কখনোই তাঁর প্রজ্ঞা বহির্ভূত হয় না এবং তা সর্বোত্তম কল্যাণময় পন্থায় সম্পন্ন হয়।

সুতরাং যদি তিনি অন্যায় ও কুৎসিত কর্ম সম্পাদন করেন (প্রকৃতপক্ষে তিনি এগুলো থেকে পবিত্র) তবে তা নিম্নলিখিত চারটি কারণে হবে-

১। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে এর কুৎসিত দিক সম্পর্কে অনবহিত।

২। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানেন। কিন্তু কাজটি করতে বাধ্য এবং তা ত্যাগ করতে অপারগ।

৩। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং কাজটি করতে বাধ্য নন কিন্তু কাজটি করা তাঁর প্রয়োজন।

৪। তিনি ঐ সম্পর্কে অবগত, তিনি তা করতে বাধ্য নন এবং তাঁর প্রয়োজনও নেই, কিন্তু তিনি তাঁর খেয়াল খুশীর জন্য কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই কাজটি করেছেন।

কিন্তু উপরোল্লিখিত কোনটিই মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং অসম্ভব। কারণ এর অনস্বীকার্য অর্থ দাড়ায়, তাঁর ঘাটতি রয়েছে। অথচ তিনি চুড়ান্তরূপে পরিপূর্ণ।

সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, তিনি সকল প্রকার অন্যায় ও কুৎসিত কর্ম থেকে পবিত্র। মুসলমানদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ মনে করে যে, আল্লাহ কুৎসিত কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। তারা বলেন যে, আল্লাহ তাঁর অনুগতদের শাস্তি দিতে পারেন, আবার পাপীষ্ঠদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে পারেন এমনকি কাফেরদেরকেও। তারা আরো বলে যে, আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের অধিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন। আর এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে উক্ত কর্ম সম্পাদন না করার জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। তিনি অন্যায়, অত্যাচার, প্রতারণা করতে পারেন কিংবা মিথ্যা ও প্রজ্ঞাহীন, উদ্দেশ্যবিহীন ও কল্যাণবিহীন নিষ্ফল কর্মও সম্পাদন করতে পারেন। আর এ ক্ষেত্রে দলিল হলো-

> **"তিনি তাঁর কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু তারা (মানুষ) জিজ্ঞাসিত হবে।"** (সুরা আম্বিয়া - ২৩)

তাদের এ নষ্ট বিশ্বাস অনুযায়ী মহান আল্লাহ অন্যায়কারী, অবিজ্ঞ রংতামাশাকারী, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক (মহান আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র)। আর এ ধরনের বিশ্বাস কুফরী ব্যতীত কিছুই নয়। মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরআনে (যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই) বলেন-

"মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কোন প্রকার অন্যায় কামনা করেন না।" (সুরা আল-মুমীন - ৩১)

"মহান আল্লাহ ফেসাদ (অনাচার) পছন্দ করেন না।" (সুরা বাকারা - ২০৫)

"আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।" (সুরা আম্বিয়া - ১৬)

"আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সুরা আয-যারিয়াত - ৫৬)

এ ধরনের আরো অনেক আয়াত আছে যে গুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ সম্পর্কে উল্লেখিত নষ্ট বিশ্বাসগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যায়।

৯. মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ মানুষকে কোন দায়িত্ব প্রদান করেন না যদি না এ সম্পর্কে চুড়ান্ত দলিল (হুজ্জাত) উপস্থাপন করেন। তিনি মানুষকে তার সাধ্যের অধিক দায়িত্ব প্রদান করেন না। যা কিছু তার বোধগম্য নয়, যা সে জানেনা তাও তিনি তার উপর অর্পণ করেন না। কারণ অক্ষমকে দায়িত্ব প্রদান করা জুলুম বা অন্যায়। অনুরূপভাবে অন্যায় হলো কাউকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বেই অবগত না করে দায়ী করা।

তবে আহকাম ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত না হওয়ার কারণে মানুষ মহান আল্লাহর নিকট দায়ী হবে এবং তার এ ভুলের জন্য সে শাস্তি পাবে। কারণ প্রত্যেক মানুষের জন্যই তার নিজের প্রয়োজনীয় শরীয়তের হুকুমগুলো জেনে নেয়া আবশ্যক।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তার সার্বিক ও চির কল্যাণের পথে তাকে পরিচালিত করার জন্য বিধান দিয়েছেন এবং এ গুলোকে তার জন্য বর্ণনা করেছেন। আবার অনাচার,

ক্ষতিকর এবং খারাপ পরিণতির পথ থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছেন। এগুলো হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের জন্য দয়া ও রহমতের দৃষ্টান্ত। তবে তারা তাদের ইহ ও পরকালীন অনেক কল্যাণ সম্পর্কে অনবগত। আবার এমন অনেক কিছু সম্পর্কে তারা জানে না যেগুলো তাদের জন্য ক্ষতিকারক। মহান আল্লাহ তাঁর স্বভাবগতভাবেই হলেন পরম দয়ালু ও দাতা। তিনি চুড়ান্তভাবে পরিপূর্ণ আর তা হলো স্বয়ং সত্তাগত এবং তাঁর থেকে এগুলোকে পৃথক করা অসম্ভব। এ দয়া ও করুণা এমনকি তাঁর অবাধ্য বান্দার অবাধ্যতার ফলে তাদের নিজের দূর্ভাগ্য ডেকে আনলেও তুলে নেয়া হয় না।

১০. ক্বাজা ও ক্বাদার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

জাবরি নামক একদল মনে করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির সমস্ত কার্যকলাপের কর্তা। তিনিই মানুষকে তার পাপ কাজের জন্য বাধ্য করেন এবং এমতাবস্থায় তিনিই তাদেরকে শাস্তি দেন; আবার তিনিই সৎকর্মে তাদেরকে বাধ্য করেন, তথাপি তিনিই ঐ কাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। জাবরিরা বলে যে, মহান আল্লাহই মানুষের কর্মকান্ডের প্রকৃত সংগঠক। তথাপি এ কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা হয়। জাবরিদের এরূপ ধারণার কারণ হলো তারা বস্তুর মধ্যকার প্রাকৃতিক কারণকে (আস-সাবাবিয়াহ আত্‌তাবিয়্যাহ) অস্বীকার করে। আর তারা বলে মহান আল্লাহ হলেন প্রকৃত কারণ (আস্-সাবাবুল হাকীকী), তিনি ব্যতীত অন্য কোন কারণ নেই।

তারা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক কারণকে অস্বীকার করার কারণ হলো, তাদের ধারণামতে মহান আল্লাহ যে শরীক বিহীন সৃষ্টি কর্তা- এ কথার দ্বারা তা ব্যহত হয়। কিন্তু এরূপ কথা দ্বারা আল্লাহর উপর জুলুম আরোপ করা হয়। অথচ মহান আল্লাহ কখনোই জুলুম করেন না।

আবার অন্য একদল হলো পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী (মুফাওভিজাহ)। তাদের মতে মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে তাদের কর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন করে দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে 'আল্লাহর শক্তির' পালনীয় কোন ভূমিকা থাকে না। তাদের এরূপ বিশ্বাসের যুক্তি হলো- মানুষের কর্মকান্ডকে আল্লাহর উপর আরোপ করার অর্থ হলো তাঁর উপর ঘাটতি আরোপ করা।

অথচ প্রত্যেক অস্তিত্বময় জিনিসেরই এক নির্দিষ্ট কারণ আছে এবং প্রত্যেক কারণই ফিরে যায় প্রথম কারণের দিকে, আর তিনিই হলেন মহান আল্লাহ। যাহোক যদি কেউ এরূপ (তাফভীজ) মতবাদ ব্যক্ত করে, তবে সে মহান আল্লাহকে তাঁর রাজত্বের বাইরে চিন্তা বা ধারণা করেছে এবং সৃজনের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করেছে।

আর এক্ষেত্রে পবিত্র ইমামগণের (আঃ) শিক্ষা থেকে আমাদের বিশ্বাস হলো মধ্যপন্থী- প্রাগুক্ত দুটি মতামতের মাঝামাঝি। এটি কালাম শাস্ত্রের এমন এক বিষয় যে, বিবাদরত কোন পক্ষই এর প্রকৃত তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে পারে না। সুতরাং একদল একদিকে প্রান্তিক ধারণা পোষণ করে আবার অন্যদল অন্যদিকে শত শত বছর পর্যন্ত জ্ঞান ও দর্শন এর নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি।

এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমাদের ইমামগণের (আঃ) প্রজ্ঞা ও বক্তব্যের সাথে পরিচিত নয় এমন কেউ ধারণা করবে যে, আমাদের এ বক্তব্য (আমরু বাইনাল আমরাইন) হলো আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জন্মজ। অথচ আমাদের ইমামগন (আঃ) দশ শতাব্দীকাল পূর্বে এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

ইমাম সাদিক (আঃ) এ বিষয়টিকে তাঁর বিখ্যাত মধ্যপন্থী বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার করেছেন-

> **"জাবর (বাধ্যবাধকতা)ও নয়, তাফভীজ (পুরো স্বাধীনতা)ও নয় বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি বিষয়।"**

সত্যিই কত সুন্দর দিকনির্দেশনা লুকিয়ে আছে এ বক্তব্যের মাঝে, কত সূক্ষ্ম এবং বাস্তব অর্থ এখানে সজ্জিত আছে। সংক্ষেপে আমাদের কর্মগুলো একদিক থেকে সত্যিই আমাদের নিজেদের কাজ (আফআলুনা হাকীকাতান) এবং আমরা এর প্রাকৃতিক কারণ (সাবাবুত তাবিয়াত)। তা আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতাধীন৷ আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তা মহান আল্লাহর প্রভাব এবং ক্ষমতাধীন। কারণ তিনিই হলেন অস্তিত্ব দানকারী। তিনি আমাদেরকে আমাদের কাজে বাধ্য করেননি যে পাপ করলে শাস্তি দিলে তাঁর অন্যায় হবে। কারণ কাজটি করার ক্ষেত্রে আমাদের ঐচ্ছিক স্বাধীনতা (এখতিয়ার) ও শক্তি ছিল। অপরদিকে আমাদের কর্মকে অস্তিত্ব দিতে তিনি আমাদেরকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেননি কারণ তা তাঁর প্রভাবাধীনে সংঘটিত হয়। কারণ সৃষ্টির মালিক, হুকুম ও আদেশের মালিক একমাত্র

তিনিই। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান এবং তিনি তাঁর সমস্ত বান্দার উপর ক্ষমতাবান।

যাহোক আমরা বিশ্বাস করি যে, ক্বাজা ও ক্বাদর হলো আল্লাহর আওতাধীন একটি নিগূঢ় রহস্য। সুতরাং যদি কেউ কোন প্রকার প্রান্তিক ধারণা ব্যতীত এ বিষয়টিকে অনুধাবন করার সামর্থ্য রাখে তবে সে এ বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে পারে। নতুবা এ বিষয়টি জোর পূর্বক সূক্ষ্ম অনুধাবনের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তা তাকে অন্ধকারের পথে পরিচালিত করতে পারে এবং তার বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। এটি একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়। এমনকি দর্শনের জটিলতম বিষয় সমূহের একটি যা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু লোক অনুধাবন করতে পারে। এর কারণেই অনেক কালামবিদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এটা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের উর্ধে। তাদের জন্য আমাদের পবিত্র ইমামগনের (আঃ) বাণী অনুসারে এ সামগ্রিক ধারণা রাখাই যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এটি হলো ঐ দু'টি বিষয়- জাবরি (অক্ষমতা বা বাধ্যতা) ও তাফভীজ (পূর্ণ স্বাধীনতা)- এর মাঝামাঝি (আমরু বাইনাল আমরাইন)। আর এটি মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত এমন কোন বিষয় নয় যে, সূক্ষ্মভাবে বা সম্যকভাবে একে অনুধাবন করতে হবে।

১১. বাদা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

মানুষের ক্ষেত্রে বাদা হলো- কোন ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া বা পরিবর্তন করা যা পূর্বে ছিল না (পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া)। তার এ সিদ্ধান্ত পবির্তনের কারণ হলো এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা যা তার জ্ঞান ও সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনে। সুতরাং কাজটি করার আগেই সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে এবং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের কারণে অনুশোচনা করে। তার জন্য কোনটি কল্যাণকর সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতার ফলেই এমনটি ঘটে।

বাদার প্রাগুক্ত অর্থ মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এটি হলো অজ্ঞতা ও ঘাটতির ফল। আর এগুলো মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইমামীয়ারা উল্লেখিত অর্থে (যা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) বিশ্বাসী নয়। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন-

"যারা মনে করে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক বাদা সংঘটিত হয় এবং এ জন্য আল্লাহকে অনুশোচনা করতে হয়, আমাদের দৃষ্টিতে তারা অবিশ্বাসী বা কাফের।"

তিনি আরো বলেন-

"আমি তাদের নিকট থেকে দূরত্ব বজায় রাখি যারা মনে করে যে, এমন কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক বাদা সংঘটিত হয় যেগুলো সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্বে জানতেন না।"

আমাদের পবিত্র ইমামগণের (আঃ) কিছু বাণীও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট যার ফলে লোকজন মনে করে আমরা বর্ণিত অর্থে বাদায় বিশ্বাস করি। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন-

"মহান আল্লাহর এমন কোন বাদা নেই যা আমার পুত্র ইসমাইলের ক্ষেত্রে হয়েছে।"

এ ধরনের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম লেখক (কালাম শাস্ত্রবিদ) ইমামীয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, ইমামীয়ারা বর্ণিতার্থে বাদায় বিশ্বাস করে। আর এভাবে তারা শীয়া মাযহাবের ও আহলে বাইতের (আঃ) পথের বদনাম ও নিন্দা করে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে যা বলেন তা-ই সঠিক। তিনি বলেন-

"তিনি বিনাশ করেন ও প্রতিষ্ঠিত করেন যা তিনি চান, আর তাঁর নিকটই রয়েছে মূল কিতাব (উম্মুল কিতাব)।" (সুরা রাদ - ৩৯)

আর এর অর্থ হলো- মহান আল্লাহ কখনো কখনো কোন কল্যাণময়ী কারণবশতঃ তাঁর নবী ও ওয়ালীদের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে কোন কিছুর প্রকাশ ঘটান। অতঃপর তা অপনোদন করেন এবং প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের পরিবর্তে অন্য কিছু ঘটান যদিও এ সম্পর্কে তাঁর পূর্বেই জ্ঞান রয়েছে। যেমন- হযরত ইসমাইলের (আঃ) কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখলেন তাঁর পুত্র ইসমাইলকে কোরবানী করতে (কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি)। আর এটাই হলো ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) কথার অর্থ যে মহান আল্লাহ ইতিপূর্বে এমন কোন কিছু প্রকাশ করেন না যা তাঁর পুত্র ইসমাইলের ব্যাপারে করেছেন। তাঁর পূর্বেই তাঁর পুত্রের জীবন নিয়ে নিয়েছেন। কারণ যাতে মানুষ জানতে পারে যে, তিনি (ইসমাইল) ইমাম

নন। যদিও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নিকট মনে হয়েছিল যে তিনি ইমাম হবেন কারণ তিনি (ইসমাইল) ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ।

বাদার এ অর্থটি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়তের পূর্বেকার শরীয়তসমূহের রহিতকরণের (নাসখ) অর্থ প্রকাশ করে, এমনকি মোহাম্মদ (সাঃ) এর কিছু শরীয়তকে রহিত (মানসুখ) করার কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে।

১২. দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, বান্দারা তাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে যাতে নিজেদের কল্যাণ সাধন করতে পারে তদানুসারেই মহান আল্লাহ শরীয়তের ওয়াজীব, হারাম ও অন্যান্য বিধানসমূহ প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং যা কিছু একান্তই আমাদের জন্য কল্যাণকর তাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেছেন। আর যার সিংহভাগ আমাদের জন্য অকল্যাণকর তাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আর অনুরূপভাবে অন্যান্য বিধান। এটা হলো বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর করুণা ও ন্যায়পরায়ণতা। স্পষ্টতঃই তাঁকে সর্বক্ষেত্রে কোন না কোন হুকুম প্রদান করতে হয়েছে (ঐ দয়া বা ন্যায়ের কারণে)। এমন কোন কিছু নেই যে সম্পর্কে তিনি বিধান দেননি যদিও আমাদের নিকট তার জ্ঞান লাভের পন্থা জানা নেই।

আমরা আরও বলি যে, যাতে অকল্যাণ রয়েছে তা করার আদেশ প্রদান এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তা নিষিদ্ধ করা অবাঞ্ছিত কাজ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেই কোন কোন মাযহাব মনে করে যে, কুৎসিত বা অবাঞ্ছিত হলো তা যা মহান আল্লাহ নিষেধ করেন। আর সুন্দর বা বাঞ্ছিত হলো তা যা মহান আল্লাহ পালন করতে আদেশ করেন। সুতরাং কল্যাণ ও অকল্যাণ স্বয়ং বা সত্তাগতভাবে যথাক্রমে সুন্দর ও অসুন্দর নয়। এমনকি সুন্দর এবং অসুন্দরও সত্তাগতভাবে সুন্দর ও অসুন্দর নয়। এ ধরনের বক্তব্য স্পষ্টতঃই বুদ্ধিবৃত্তি পরিপন্থী। এরাই বলে যে, আল্লাহ কুৎসিত ও অবাঞ্ছিত কাজও করতে পারেন। যেমন- যা অসুন্দর তিনি তা করতে আদেশ দিতে পারেন। আবার যা সুন্দর তা করতে নিষেধ করতে পারেন। ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে এটি একটি মহাভ্রান্ত ধারণা। কারণ এর অর্থ হলো আল্লাহ অজ্ঞ ও অক্ষম (মহান আল্লাহ এগুলোর উর্ধে)।

সংক্ষেপে এ প্রসংগে সঠিক ভাবে বলা যায় যে, আমাদের কর্মকান্ডের আবশ্যকতায় ও নিষেধে (কোন কাজ আমাদের জন্য ওয়াজিব বা হারাম হওয়ায়) মহান আল্লাহর কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ নেই, বরং সমস্ত কর্মকান্ডের কল্যাণ বা অকল্যাণ আমাদের দিকেই ফিরে আসে। সুতরাং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কর্মকান্ডের কল্যাণ ও অকল্যাণকে অস্বীকার করার কোন অর্থই থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ অহেতুক ও লক্ষ্যহীন কোন কিছু আদেশ বা নিষেধ করেন না। তিনি তাঁর বান্দাদের মুখাপেক্ষী নন।

পর্ব-২

নবুওয়াত

১৩. নবুওয়াত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, নবুওয়াত হলো একটি ঐশী দায়িত্ব এবং আল্লাহর মিশন। তিনি একাজে তাঁদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন যাঁদেরকে তিনি তাঁর যোগ্য ও পরিপূর্ণ মানবতার মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে অন্যান্য মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন যাতে মানুষের ইহ ও পরকালীন লাভ ও কল্যাণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারেন, যাতে চারিত্রিক কলুষতা, শয়তানী কর্মকান্ড ও ক্ষতিকর আচরণ থেকে মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছেন যাতে তারা মানুষকে জ্ঞান দিতে পারেন এবং কল্যাণ ও সফলতার পথ দেখাতে পারে, মানুষকে সে স্থানে পৌছে দিতে পারেন যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এভাবে দুনিয়া এবং আখেরাতের সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে তাদেরকে অধিষ্ঠিত করাতে পারেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, দয়া-নীতির (কায়েদাতুললুতফ যার অর্থ পরে বর্ণনা করা হবে) দাবী হলো যে, দয়াময় সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের হেদায়াতের জন্য, পূর্ণগঠনের জন্য এবং তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রাসুল প্রেরণ করবেন।

অনুরূপ আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নবীর মনোনয়ন, নির্ধারণ ও নির্বাচনের অধিকার দেননি। কেবলমাত্র মহান আল্লাহই নবী হিসেবে কাউকে মনোনয়ন ও নির্বাচন করতে পারেন। কারণ- আল্লাহই ভাল জানেন যে কোথায় তার বাণী রাখবেন। সুতরাং পথ প্রদর্শক, সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে মহান আল্লাহ যাঁদেরকে পাঠিয়েছেন তাঁদের সাথে বিতর্ক করার অধিকার কারো নাই। সেরূপ কারো অধিকার নেই যে বিধান, সুন্নত ও শরীয়ত হিসেবে তাঁরা যা এনেছেন ঐ ব্যাপারে সে সন্দেহ করবে।

১৪. নবুওয়াত হলো মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক দান (লুত্‌ফ) ঃ

মানুষ হলো এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার অস্তিত্ব, প্রকৃতি, আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে রয়েছে এক জটিল সমন্বয়। এমনকি মানব জাতির প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান জটিল প্রকৃতির সমন্বয়। একদিকে রয়েছে অনাচারের প্রবণতা আর অপরদিকে রয়েছে কল্যাণ ও উত্তমের কারণসমূহ। একদিকে আত্মপ্রীতি, কামনা-বাসনার মত আবেগ ও প্রবণতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যার ফলে সে তার কামনার বশবর্তী হয়ে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। সম্পদ সংগ্রহ করতে চায় এবং অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করতে চায় এবং অপরিনামদর্শী হয়ে পার্থিব রূপ জৌলুসের দিকে ধাবিত হতে চায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন -

"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে"। (সুরা আসর - ২)

"নিশ্চয়ই মানুষ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে, কারণ সে নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করছে।" (সুরা আলাক - ৬-৭)

তিনি আরও বলেন-

"নিশ্চয়ই নফসে আম্মারা (মন্দকর্মপ্রবণ মন) মানুষকে অসৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে।" (সুরা ইউসুফ - ৫৩)

এছাড়া এমন আরো অনেক আয়াত আছে যাতে দেখা যায় যে, মানুষের আত্মা হলো কামনা বাসনা ও আবেগ অনুভূতিতে পূর্ণ।

অপরদিকে মহান আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি (আকল) দিয়েছেন যাতে সে স্বীয় কল্যাণ ও উন্নতির পথকে সনাক্ত করতে পারে। তিনি তাকে বিবেকও দিয়েছেন যা তাকে অন্যায় ও অপছন্দনীয় পথে যেতে বাধা প্রদান করে।

মানুষের অভ্যন্তরে তার কামনা ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বিরাজমান রয়েছে অবিরত সংঘর্ষ। যখন তার বুদ্ধিবৃত্তি তার কামনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তখন সে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং মানবতার সমুন্নত উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু যখন তার কামনা তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরাস্ত করে তখন সে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নিকৃষ্টতম মানবে পরিণত হয় সে যাকে পশুর সাথে তুলনা করা যায়।

বিবাদরত (আকল এবং কামনা) এ দুয়ের মধ্যে কামনা ও তার সৈন্যরা অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী। আর এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ ধ্বংসের পথে পতিত হয় এবং মুক্তির পথ থেকে দূরে সরে যায়, তাদের কামনাকে অনুসরণ করে ও বাসনার ডাকে সাড়া দেয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

"হে নবী! তুমি যতই কামনা কর না কেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈমান আনবে না।" (সুরা ইফসুফ - ১০৩)

তাছাড়া সে পৃথিবীর সকল সত্য সম্পর্কে এবং তার নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন ও অজ্ঞ। এমনকি সে নিজের সম্পর্কেও অজ্ঞ। কিসে তার লাভ, কিসে তার ক্ষতি, কিসে তার কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ কেমন করে সে তা জানবে? আর নিজের কল্যাণের বা সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণের যাবতীয় বিষয় কিভাবে সে জানতে পারবে? যখনই সে নতুন কোন আবিস্কার নিয়ে অগ্রসর হয় তখনই সে অজ্ঞতাকে দেখতে পায় আর উপলব্ধি করে যে সে আসলে কিছুই জানেনা। আর এ কারণে একান্তভাবেই মানুষের জন্য এমন কারো প্রয়োজন যে তাকে কল্যাণ ও সুখের পথ দেখাবে তখন যখন তার কামনা তাকে প্রতারিত করে, সুকর্মকে কুকর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করে কিংবা কু-কর্মকে সুকর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে যার ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয় ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সঠিক পথ খুঁজে নিতে পারে না কিংবা প্রকৃত ভাল ও মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি ও কামনার এ যুদ্ধে সচেতনভাবে হোক বা অবচেতনভাবে হোক আমরা সকলেই বশীভূত কেবলমাত্র তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেন। একজন সুশিক্ষিত ও সৎব্যক্তির পক্ষেও যেখানে ভাল মন্দের পার্থক্য করা কঠিন সেখানে কি করে তা একজন অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হবে?

সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে আলোচনা করলেও কিসে তাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ তা তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। তাই মহান আল্লাহ মানুষের উপর করুণা প্রদর্শন করে নবী প্রেরণ করেন। যেমন- পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

"রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে যিনি তাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন।" (সুরা জুমুআহ - ২)

আর তিনি (নবী) তাদেরকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং কল্যাণ ও সুখের সুসংবাদ দিবেন।

এধরনের দয়া করা মহান আল্লাহর কর্তব্য। কারণ তাঁর বান্দাদের উপর এ দয়া করা তাঁর নিরঙ্কুশ পূর্ণতারই বহিঃপ্রকাশ। আর তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও উদার হস্ত। যখন কেউ তাঁর দয়া ও উদারতা লাভের যোগ্য হয় তখন তিনি অবশ্যই সেখানে তা দান করেন। কারণ, রহমতের ব্যাপারে আল্লাহর কোন কৃপণতা নেই। আর এখানে কর্তব্য অর্থ এ নয় যে, কেউ তাঁকে হুকুম করেন বা বাধ্য করেন যার ফলে তিনি তা তামিল করেন। বরং এখানে আবশ্যকতা বা কর্তব্যের অর্থ হলো, আমাদের কথায় আমরা যাকে বলি আবশ্যকীয় অস্তিত্ব (বা ওয়াজীবুল ওজুদ)। অর্থাৎ তিনি আবশ্যকীয়রূপে বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্ব তিনিই এবং তাঁর অস্তিত্ব থেকে তাঁকে পৃথক করা যায় না।

১৫. নবীগণের মোজেযা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে তাঁর সৃষ্টির জন্য পথ প্রদর্শক ও সংবাদ বাহক রূপে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁকে সুস্পষ্টরূপে মানুষের নিকট পরিচয় করিয়ে দেন। আর এর একমাত্র উপায় হলো তাঁর রেসালাতের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা যাতে করে মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা মানুষের জন্য পরিপূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। আর সে দলিল এমন হতে হবে যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কারো পক্ষে তা সম্ভব নয় এবং তা বাস্তবায়িত হবে হেদায়াতকারী রাসূলের হাতে যা হবে তাঁর পরিচায়ক ও তাঁর স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। আর এ দলিল বা প্রমাণ হলো তা-ই যাকে আমরা মোজেয (অপরকে অপারগ করা) বা মোজেযা নামকরণ করে থাকি। কারণ তা আনয়ন করতে মানুষ অক্ষম ও অপারগ।

একজন নবীও যখন নিজেকে নবী হিসেবে পরিচয় দেন তখন তাঁর দলিল রূপে মোজেযার পন্থা অবলম্বন করা ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। আর এ মোজেযা এমন হয় যে সমসাময়িককালের জ্ঞানী ও গুণীরাও যেখানে তা প্রদর্শন করতে অক্ষম সেখানে অন্যান্য সাধারণ মানুষের কথাতো বলাই বাহুল্য। তাছাড়া এ মোজেযা নবুওয়াতের দাবীর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে যা তাঁর দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত হবে। যখন তা আনয়ন করতে

নবী ব্যতীত অন্য কেউ অপারগ হবে তখন সে জানতে পারবে যে, এটি মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধে এবং অলৌকিক বিষয়। আর এভাবে তারা জানতে পারে যে, এ মোজেযা আনয়নকারী হলেন একজন অতিমানব যার সাথে সমগ্র জগতের পরিচালকের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। অনুরূপভাবে যখন এমন কোন নবী যিনি মোজেযা প্রদর্শন করেছেন এবং মানুষকে তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাতের প্রতি আহবান জানান, তখন সহজেই মানুষের নিকট তাঁর কথার সত্যতা গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আদেশ পালন করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। আরও আবশ্যক তিনি যাতে বিশ্বাস করেন তাতে বিশ্বাস করা এবং তিনি যাতে অবিশ্বাস করেন তাতে অবিশ্বাস করা।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক নবীর মোজেযা তাঁর সমসাময়িককালের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, কলা ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের উপর প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আর এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, হযরত মুসার (আঃ) মোজেযা হলো লাঠি যা যাদুকরদের সমস্ত মিথ্যাচারকে বিনাশ করেছিল। কারণ হযরত মুসার (আঃ) সমসাময়িককালে যাদুবিদ্যা ছিল জনপ্রিয় কলা। তাঁর এ লাঠি সমস্ত মিথ্যাকে অসার করে দিলে সকলের জানা হয়ে গেল যে এটি তাদের ক্ষমতা বর্হিভূত এবং তাদের কলা-কৌশলের ঊর্ধে। আর কোন মানুষের পক্ষে এমনটি প্রদর্শন করা অসম্ভব। সুতরাং তাদের সকল বিজ্ঞান ও কলা এর সম্মুখে মূল্যহীন ও অকার্যকর।

অনুরূপ হযরত ঈসার (আঃ) মোজেযা ছিল জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য প্রদান করা আর মৃতকে জীবিত করা। কারণ তিনি এমন এক সময় এসেছিলেন যখন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগনিত হত। কিন্তু তাদের কোন জ্ঞানই ঈসার (আঃ) প্রদর্শিত বিষয়ের মত নয়।

আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর রয়েছে চিরন্তন মোজেযা। আর তা হলো অভূতপূর্ব সাহিত্যমান সম্পন্ন ও চূড়ান্ত বাগ্মীতা সম্বলিত পবিত্র কোরআন (যাকে আরবী পরিভাষায় বলে ফাসাহাত ও বালাগাত)। কারণ তদানীন্তনকালে সাহিত্য ও বাগ্মীতা এর চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল। তখন সাহিত্যিকরা ছিল সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি, তাদের সুন্দর বাচনভঙ্গি ও শ্রুতিমধুরতার কারণে। সুতরাং কোরআন বজ্রপাতের মত এসে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞাপন করল ও বিস্মিত করল এবং

বুঝিয়ে দিল যে, তারা এমন কিছু করতে অক্ষম। তারা এর সম্মুখে পরাস্ত ও অবনত হলো। আর তাদের অপরাগতার প্রমাণ মেলে তখনই যখন পবিত্র কোরআন তাদেরকে এর দশটি সুরার মত সূরা আনয়নের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহবান করল এবং তারা অক্ষমতা প্রকাশ করল। অতঃপর বলা হলো মাত্র একটি সূরা আনতে। তাতেও তারা অপারগ হলো। আমরা জানি যে, তারা একটি সূরা আনয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে তারা বাকযুদ্ধের পরিবর্তে তরবারির যুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছিল।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, কোরআন হলো একটি মোজেযা যা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুওয়াতের দাবীর সপক্ষে আনয়ন করেছেন। সুতরাং আমরা জানি যে, তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আর এ সত্য (পবিত্র কোরআন) তিনি নিয়ে এসেছেন।

১৬. নবীগণের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীগণ হলেন সব দিক থেকে পবিত্র। তাঁদের মত ইমামগণও (আঃ) পবিত্র। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ নবীগণের (আঃ) পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না, ইমামগণের (আঃ) পবিত্রতা তো দূরের কথা।

এসমাত বা পবিত্রতা হলো যে কোন প্রকার গুনাহ (হোক সে ছোট বা বড়) বা ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা যদিও তাঁদের দ্বারা এগুলো সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিষিদ্ধ (বাতিল) করা হয় না। কিন্তু তাঁদের এগুলো থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক। এমনকি শিষ্টাচারগতভাবে যেগুলো দৃষ্টিকটু ও অপছন্দনীয় তা থেকেও মুক্ত থাকা আবশ্যক। যেমন- মানুষের সাথে অশিষ্ট আচরণ, রাস্তায় দাড়িয়ে খাওয়া, উচ্চস্বরে হাসা, কিংবা এমন কিছু করা যা মানুষের নিকট অসুন্দর ও অপছন্দনীয়।

নবীগণের পবিত্র হওয়ার আবশ্যকীয়তার দলিল ঃ যদি নবী কর্তৃক পাপ ও ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি এ জাতীয় কাজগুলো সংঘটিত হয়, তাহলে তা পালন করা (পাপ হোক বা ভুল-ত্রুটি) হয় আমাদের জন্য আবশ্যক হবে, না হয় আবশ্যক হবে না। যদি তাঁদেরকে অনুসরণ করা আবশ্যক হয়, তবে পাপ কাজ করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বৈধ হবে, এমনকি তা করা আমাদের জন্য ওয়াজীব হবে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ও দ্বীনের

সুস্পষ্ট দলিলের উপস্থিতিতে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আবার যদি তাদের অনুসরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক না হয় তবে নবুওয়াতই অস্বীকৃত হয়। কারণ একান্ত বাধ্যগতভাবেই নবীকে অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং কথায় ও কাজে তিনি যা করবেন তাতে যদি পাপ ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাঁকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য অসম্ভব। ফলে তাঁর নবুওয়াতের উদ্দেশ্যেই ব্যাহত হবে। এমনকি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই হয়ে যাবেন নবী যার কথা বা কাজের সে সমুন্নত মূল্য থাকবে না যা আমরা সর্বদা আশাকরি। ফলে তাঁর কোন কথা ও কাজ এবং আদেশই অনুসরণীয় হবে না এবং বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না।

আর এ দলিল ইমামগণের পবিত্রতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ আমরা মনে করি যে, ইমামগণও (আঃ) মহান আল্লাহ কর্তৃক মানুষের হেদায়াতের জন্য নবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগকৃত হবেন। [ইমামত অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে]

১৭. নবীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, যেমনি করে তাঁর পবিত্র হওয়া আবশ্যক তেমনি আবশ্যক সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ থাকা। যেমন- সাহসিকতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ধৈর্য, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিতা ইত্যাদি। অর্থাৎ কেউই এ সকল বৈশিষ্ট্যে তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কারণ যদি তা না হয় তবে সকল সৃষ্টির উপর তাঁর সার্বজনীন প্রাধান্য থাকতে পারে না এবং সামগ্রিকভাবে জগতকে পরিচালনা করার মত সামর্থ্য তাঁর থাকবে না।

অনুরূপ তাঁকে হতে হবে জন্মগতভাবে পবিত্র বংশোদ্ভূত, সৎ, সত্যবাদী। এমনকি নবুওয়াতের ঘোষণার পূর্বেও তাঁকে সমস্ত প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে যাতে মানুষ তাঁকে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করতে পারে, তাঁর নিকট আশ্রয় পেতে পারে এবং সংগত কারণেই তিনি এ মহান ঐশী মর্যাদার (পবিত্রতা) উপযুক্ত।

১৮. পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

সামগ্রিকভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, সমস্ত নবী ও রাসুল হলেন সত্য। তেমনি তাঁদের এসমাত বা পবিত্রতায়ও আমরা বিশ্বাস করি। আর তাঁদের নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, তাদের কুৎসা করা, বিদ্রূপ করা হলো কুফরি ও নাস্তিকতা। আর এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদকেই (সাঃ) অস্বীকার করা হয়। কারণ তিনিই তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের ব্যাপারে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন এবং সত্যায়িত করেছিলেন।

হযরত আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), দাউদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ) এবং অন্যান্য যাঁদের নাম পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের নাম এবং শরীয়ত প্রসিদ্ধ, বিশেষকরে তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। আর যদি কেউ তাঁদের একজনকে অস্বীকার করে তবে সে যেন সকলকে অস্বীকার করল। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবীর (সাঃ) নবুওয়াতকে অস্বীকার করল।

অনুরূপভাবে তাঁদের গ্রন্থসমূহ এবং তাঁদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনাও আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে যে ইঞ্জিল ও তৌরাত মানুষের নিকট আছে তা যেরূপ নাযিল হয়েছিল সেরূপ আর নেই। বর্তমানে এতদ্ভয়ের মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রমাণ মিলে যা হযরত মুসা (আঃ) ও ঈসার (আঃ) পর সংঘটিত হয়েছে। এক ধরনের লোভী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদের দ্বারা এ বিকৃতি সাধিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যা আছে তার অধিকাংশই হযরত মূসা (আঃ) ও ঈসার (আঃ) পর তাদের অনুসারীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

১৯. ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামই হলো মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এটি সত্য ঐশী বিধান, সর্বশেষ শরীয়ত, পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের রহিতকারী শরীয়ত, পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিধান যাতে সন্নিবেশিত আছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত কল্যাণ ও

সফলতার উপায়। এ বিধান সমস্ত সময় ও কালের জন্য অবশিষ্ট থাকার উপযুক্ত এবং কখনো পরিবর্তন হবে না। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল চাহিদার জবাবের সমাহার ঘটেছে এ বিধানে। এটি হলো সর্বশেষ শরীয়ত, এরপর আর কোন শরীয়ত আসবে না। জুলুম ও ফেসাদে মুহ্যমান মানবতাকে এ শরীয়ত পরিশুদ্ধ করে। আর তাই এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন ইসলাম ধর্ম আরো শক্তিশালী হবে এবং এর ন্যায়-নীতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

যখন এ বিশ্বে সমগ্র মানুষ পরিপূর্ণরূপে ইসলামের বিধান মেনে চলবে, তখন মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। জন কল্যাণ, মান-সম্মান, ঐশ্বর্য, মানবীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের শীর্ষে আরোহন করবে। অপরদিকে জুলুম-অত্যাচার, দারিদ্র ইত্যাদি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ দ্বারা পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। বর্তমানে আমরা কিছু মুসলমান নামধারী মানুষের মাঝে যে লজ্জাকর পরিস্থিতি লক্ষ্য করছি তার কারণ হলো, প্রথম থেকেই তাদের আচার ব্যবহার প্রকৃতার্থে ইসলামী বিধান মোতাবেক ছিল না। আর এ অবস্থা চলতে চলতে পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মুসলমানদের লজ্জাকর পশ্চাৎপদতার কারণ ইসলামকে গ্রহণ করা নয়। বরং এর কারণ হলো ইসলামের শিক্ষাকে অমান্য করা, ইসলামী নিয়ম-নীতিকে অগ্রাহ্য করা, তাদের শাসকবর্গ কর্তৃক অন্যায় এবং শত্রুতাকে দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। আর এগুলো কারণই তাদের উন্নতি ও অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাদেরকে করেছে দুর্বল, তাদের মনুষ্যত্বকে করেছে ধ্বংস। পরিশেষে তারা পতিত হয়েছে দুঃখ দূর্দশায়। আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপ দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

> **"এটা এ কারণে যে, আল্লাহ কোন জাতির উপর তাঁর দেয়া নেয়ামতকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের মধ্যে যা কিছু আছে তার পরিবর্তন করে।"** (সুরা আনফাল - ৫৩)

আর আল্লাহর সৃষ্টির জন্য এটাই তাঁর বিধান। কোরআন আরও বলে-

> **"অন্যায়কারীরা কখনোই সফল হবে না।"** (সুরা ইউনুস - ১৭)

অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে-

> **"নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কোন জাতিকে তাদের অন্যায়ের জন্য ধ্বংস করেন না যখন তারা নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টায় রত থাকে।"** (সূরা হুদ - ১১৭)

পুনরায় বর্ণিত হয়েছে-

> **"আর এরকমই হলো শহরের জালিম অধিবাসীদের জন্য তোমার প্রভুর শাস্তি। তোমার প্রভুর শাস্তি সত্যিই কঠোর।"** (সূরা হুদ - ১০২)

আমরা এমন এক দ্বীন থেকে কি করে আশা করতে পারি যে, ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়া তার অনুসারীদেরকে রক্ষা করবে যেখানে এর শিক্ষা শুধুমাত্র কাগজে কলমে শোভা পাচ্ছে এবং বিন্দুমাত্র এর শিক্ষার অনুশীলন নেই?

ইসলামের ভিত্তিমূল হলো- বিশ্বাস, সততা, সত্যবাদিতা, শিষ্টতা, শালীনতা ও ত্যাগ। একজন মুসলমান তার ভাইয়ের জন্য তা-ই আশা করে যা সে নিজের জন্য করে। কিন্তু মুসলমানরা সুদীর্ঘ কাল পূর্বেই এগুলোকে পশ্চাতে ফেলে এসেছে।

সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে ততই তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন দল ও উপদলে। পার্থিব বিষয় আশয়ের জন্য করছে তারা প্রতিযোগিতা। অনর্থক কোন বিষয়বস্তুর জন্য আপন খেয়ালে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করছে কিংবা কাফের বলে আখ্যায়িত করছে। তারা ভুলে যাচ্ছে ইসলামকে এবং তাদের নিজেদের ও সমাজের কল্যাণকে। যে বিষয়গুলোর উপর তারা পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় সেগুলোর উদাহরণ হলো নিম্নরূপ- কোরআন কি সৃষ্টি না সৃষ্টি নয়; বেহেশত ও দোযখ কি তৈরী করা হয়েছে না ভবিষ্যতে হবে ইত্যাদি। আর এগুলোর উপর ভিত্তি করেই তারা পরস্পরকে কাফের বলছে।

তাদের এ মতবিরোধের ধরন দেখে অনুধাবন করা যায় যে তারা প্রকৃত প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কালের প্রবাহে তাদের এ বিচ্যুতি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অজ্ঞতা ও বিপথগামিতা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু তারা অকার্যকর তুচ্ছ কুসংস্কার ও কল্পিত বিষয়বস্তু নিয়ে বসে আছে। পারস্পরিক সংঘাত, সংঘর্ষ ও আত্মম্ভরিতা তাদেরকে দিন দিন হতাশার অতল গহীনে নিমজ্জিত করছে। অপরদিকে ইসলামের চিরশত্রু পাশ্চাত্য উত্তর উত্তর শক্তিশালী হচ্ছে এবং

মুসলমানরা যখন ঘুমে, অর্ধঘুমে তখন তারা ইসলামী দেশগুলোকে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়ে চলেছে। এ দূর্ভাগ্যের শেষ কোথায় তা একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন।

> **"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ঐ শহরের অধিবাসীদেরকে তাদের পাপের জন্য ধ্বংস করেন না যখন তারা নিজেদেরকে সংশোধনে রত থাকে।"** (সুরা হুদ - ১১৭)

আজ অথবা কাল যেদিনই হোক না কেন সুখ সমৃদ্ধির জন্য মুসলমাদেরকে তাদের নিজেদের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা করতেই হবে এবং তা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। তাদেরকে এবং তাদের বংশধরদেরকে সঠিক ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে ও পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে হবে। আর এ রূপেই তারা নিজেদেরকে এ ভয়ংকর দুঃখ দুর্দশা থেকে পবিত্রাণ করাতে পারবে। আর এরকমটি করলে ন্যায়-নীতিতে বিশ্ব সেরূপ পরিপূর্ণ হতে বাধ্য যেরূপ অন্যায় ও অত্যাচারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) প্রতিশ্রুতি এমনটিই। কারণ এ দ্বীনই (ইসলাম) হলো সর্বশেষ ধর্ম যার অনুসরণ ব্যতীত পৃথিবীতে কল্যাণ ও শান্তি ফিরে আসবে না। এটা সত্য যে, ইসলামকে কুসংস্কার, বিকৃতি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য একজন ইমামের আবশ্যকতা রয়েছে। তিনি মানবতাকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে পূর্ণ কলুষতা, অব্যাহত অন্যায় অত্যাচার যা মানুষের আত্মা ও চারিত্রিক মূল্যবোধের জন্য অনাকাঙ্খিত তা থেকে রক্ষা করবেন। মহান আল্লাহ সে ইমামের আবির্ভাব ত্বরান্বিত ও সহজ করুন।

২০. ইসলামের মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামের বাণী বাহক হলেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ) যিনি সর্বশেষ নবী, প্রেরিত পুরুষদের সর্দার এবং নিঃশর্তভাবে তাদের শ্রেষ্ঠতম। তেমনি তিনি সকল মানুষের শীর্ষে। তাঁর (সাঃ) শ্রেষ্ঠত্বের সাথে কাউকে তুলনা করা যায় না। বদান্যতার দিক থেকে কেউ তাঁকে ছুতে পারে না। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে কেউই তাঁর নিকটবর্তী নয়। সৃষ্টিকুলে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই হলেন সৃষ্টির সেরা। সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।

২১. পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহর বাণী যা তিনি মহানবী হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) উপর নাযিল করেছেন। এতে সবকিছু বর্ণিত হয়েছে। এটি হলো একটি চিরন্তন মোজেযা। মানুষের পক্ষে এরূপ সাহিত্যমান ও বাগ্মীতাসম্পন্ন কিছু রচনা করা অসম্ভব। এতে রয়েছে উচ্চতর জ্ঞান ও সত্য। কখনোই এতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধিত হবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে কোরআন এখন আমাদের নিকট আছে এবং যা আমরা এখন পাঠ করি তা সেই কোরআন যা মহানবীর (সাঃ) উপর নাযিল হয়েছিল। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম দাবী করে তবে সে হয় দুষ্ট প্রকৃতির লোক অথবা কুচক্রী কিংবা পথভ্রষ্ট। আর এ ধরনের লোকেরা হেদায়াতপ্রাপ্ত নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন-

> **"অগ্র ও পশ্চাৎ (কোন দিক থেকেই) মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারবে না।"** (সুরা হামীম সেজদাহ - ৪২)

কোরআনের অলৌকিকত্বের (মোজেযা) স্বপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো এই যে, সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞান ও কলা ততই অগ্রসরমান হচ্ছে, তথাপি কোরআন সমুন্নত চিন্তা-চেতনায় চির ভাস্বর ও মধুময়। এমন কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ এতে নেই যা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সুনিশ্চিত দার্শনিক কোন সত্যের সাথেই কোরআন সাংঘর্ষিক নয়। অপরদিকে অনেক সনামধন্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রয়েছেন যারা চিন্তা ও জ্ঞানের দিক থেকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছেন অথচ তাদের গ্রন্থেও অন্ততঃপক্ষে কিঞ্চিত স্ববিরোধিতা কিংবা ন্যূনতম ভুল হলেও পাওয়া যায়। অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি ও আধুনিক তথ্যের ফলে এমনকি সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটলের মত প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিকদের যাদেরকে পরবর্তীরা চিন্তা ও জ্ঞানের জনক ও শিক্ষক হিসেবে স্বীকার করেছেন তাদের গ্রন্থেও কিছু ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, কথায় ও কাজে কোরআনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। সুতরাং কোরআনের কোন শব্দকে কিংবা শব্দাংশকে (অক্ষরকে) অপবিত্র করা অবৈধ। অনুরূপ অবৈধ হলো অপবিত্র অবস্থায় এর কোন শব্দ বা অক্ষর স্পর্শ করা। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

"পবিত্ররা ব্যতীত কেউই একে স্পর্শ করতে পারে না।" (সুরা ওয়াকিয়া - ৭৯)

আর এ আদেশ বড় ধরনের অপবিত্রতা যেমন- জানাবাত, হায়েজ, নেফাস ইত্যাদির ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য তেমনি ছোট ধরনের অপবিত্রতা যেমন- ঘুম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসবের জন্য ফিকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত ব্যাখ্যা মোতাবেক গোসল বা অজু করলে কোরআন স্পর্শ করা বৈধ হবে।

অনুরূপভাবে কোরআনকে অগ্নিদগ্ধ করা বৈধ নয়। সেরূপ বৈধ নয় অপমান করা তা যে কোন ভাবেই হোক না কেন। অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে যেটা অপমান বলে পরিগনিত হয় তা করা যাবে না। যেমন- নিক্ষেপ করা, অপরিস্কার করা, পা দিয়ে ঠেলে দেয়া কিংবা অসম্মানজনক জায়গায় রাখা। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোল্লিখিত যে কোন একটি কাজ অথবা এ ধরনের কোন কাজ করে তবে সে ইসলাম ও এর পবিত্রতাকে অস্বীকারকারীদের মধ্যে পরিগণিত হবে। সে দ্বীনে অবিশ্বাসী। প্রকারান্তরে সে বিশ্বাধিপতি আল্লাহকে অস্বীকার করেছে।

২২. ইসলাম ও তৎপূর্ববর্তী ঐশী ধর্মসমূহকে প্রতিপাদন করার উপায় ঃ

যদি কেউ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের নিকট প্রশ্ন তোলে তাহলে আমরা এক চিরন্তন মোজেযাকে প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রতিপাদন করতে পারি। আর তা হলো পবিত্র কোরআন যার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তা আমাদের প্রাথমিক প্রশ্ন বা দ্বিধাকে দূরীভূত করে আমাদের অন্তরকে তুষ্ট করারও উপায়। মুক্ত চিন্তার অধিকারী কিছু মানুষ যারা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে চায়, তাদের মনে কখনো কখনো কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। এ পন্থা অবলম্বন করে আমরা তাদেরকেও তুষ্ট করতে পারি।

পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ যেমন- ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদিতে সন্দেহ করলে তাদের সত্যতা প্রমাণ করতে আমাদের নিজেদেরকে ও সন্দেহবাদী প্রশ্নকারীকে তুষ্ট করার কোন পন্থা নেই যদি না সর্বাগ্রে কোরআনের সত্যতা প্রমাণ করি ও ইসলামের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থেকে তা নিষ্কাশন করি। কারণ কোরআনের মত এমন কোন মোজেযা ঐগুলোর (সত্যতা প্রমাণের)

জন্য আজ আর আমাদের হাতে অবশিষ্ট নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের (আঃ) মোজেযা ও অলৌকিক ঘটনা তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়। বর্ণনার ধরনে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থ বলে পরিগণিত যে সমস্ত গ্রন্থ আমাদের নিকট আছে যেমন- তৌরাত, ইঞ্জিল তা কোনভাবেই চিরন্তন মোজেযা নয়। যা দ্বারা কাঙ্খিতরূপে ঐ ধর্মগুলোর সত্যতা প্রমাণের জন্য এমন কোন তুষ্টকারী দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যায় যেটি ইসলামের সত্যতাকে স্বীকার করলে করা যায়।

স্পষ্টতঃই আমাদের জন্য (যেহেতু আমরা মুসলমান) পূর্ববর্তী ধর্মের নবীদেরকে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। কারণ আমরা যখন ইসলাম ধর্মকে স্বীকার করে নিব তখন ইসলামে যা কিছু আছে কিংবা যা কিছুকে সত্যায়িত করে তার সবগুলোকে মেনে নেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। আর ইসলামের একটি শিক্ষা হলো পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয়া যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, মুসলমানগণ ইসলামের শিক্ষাকে বক্ষে ধারণ করার পর ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের ও তৎপূর্ববর্তী ধর্মগুলোর সত্যতা প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ ইসলামের সত্যতা স্বীকার করার মানেই হলো পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যতা স্বীকার করা। ইসলামে বিশ্বাস করার মানেই হলো পূর্ববর্তী রাসুলগণে বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং মুসলমানদের জন্য ঐ ধর্মগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং ঐগুলোর বাহকের মোজেযা সম্পর্কে অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ ইসলামে বিশ্বাস করার কারণেই পূর্ববর্তী ধর্ম ও নবীগণের উপর বিশ্বাস করা তার জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, যদি কেউ ইসলামের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করেও তুষ্ট না হতে পারে (তার জ্ঞান ও পরিচিতির সীমাবদ্ধতার কারণে) তবে তাকে খ্রীষ্টান ধর্মের সত্যতা অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ ইসলামের পূর্বে সর্বশেষ ধর্ম হলো এটিই। অতঃপর তাতে অনুসন্ধান করল কিন্তু তাতেও বিশ্বাস আনতে পারল না। তবে তাকে এর অব্যবহতি পূর্বের ধর্ম নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে। আর এ ধর্মটি হলো ইহুদী ধর্ম। তাতেও যদি ফল না হয় তবে তাকে কোন ধর্ম সম্পর্কে ইয়াকীন বা বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত একে একে সব ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

বিপরীতক্রমে, যে ইহুদী বা খ্রীষ্টবাদে বিশ্বাসী তার ব্যাপার এর বিপরীত। সুতরাং একজন ইহুদীকে নিজের ধর্মের ব্যাপারে বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে খ্রীষ্টবাদ বা ইসলামের সত্যতা অনুসন্ধানের কোন অর্থ থাকতে পারে না। বরং (কোন ধর্মের প্রতি বদ্ধমূল ধারণার পূর্বে) বুদ্ধিবৃত্তির দাবী হলো গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো। অনুরূপ, খ্রীষ্টানদেরও কেবলমাত্র খ্রীষ্টবাদ নিয়ে তুষ্ট থাকা উচিৎ নয়। বরং তার জন্য আবশ্যক হলো ইসলাম ধর্ম ও এর সত্যতা সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান করা। গবেষণা ও অনুসন্ধান ব্যতীত কোন ধর্মে তুষ্ট থাকার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ ইহুদী ধর্ম এবং তদানুরূপ খ্রীষ্টান ধর্মের কোনটিই তাদের পরবর্তী এমন কোন ধর্মের আবির্ভাবকে অস্বীকার করে না যা এদের স্থলাভিষিক্ত ও এতদুভয়ের রহিতকারী হবে। মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) দু'জনের কেউই বলেননি যে, তাদের পরে কোন নবী আসবে না।

অতএব, কিরূপে ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের বিশ্বাসের উপর নিশ্চিত থাকতে পারে এবং তাদের দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকতে পারে যদিও তারা তাদের পরবর্তী শরীয়তের উপর অনুসন্ধান চালায়নি? যেমন- ইহুদীরা খ্রীষ্টান ধর্মের উপর; অনুরূপ, খ্রীষ্টানরা ও ইহুদীরা ইসলামের উপর। কিন্তু ফিতরাতগত (স্বভাবগত) বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা হলো পরবর্তী দাবীর সত্যতার উপর অনুসন্ধান চালানো। কারণ যদি তখন এর সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে স্বীয় দ্বীন ত্যাগ করে শেষোক্ত দ্বীনে বিশ্বাস আনয়ন করবে এবং যদি এর সত্যতা প্রমাণিত না হয় তা'হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিধান মোতাবেক তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে বহাল থাকাই সঠিক।

তবে মুসলমান (যা ইতিপূর্বে বলেছিলাম) যেহেতু ইসলামে বিশ্বাস করে, সেহেতু তার জন্য অন্য কোন ধর্মে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই, হোক সে এর পূর্ববর্তী ধর্ম কিংবা এর পরবর্তী কোন ধর্ম। পূর্ববর্তী ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়োজন না থাকার কারণ ইসলাম ঐগুলোকে সত্যায়িত করছে। সুতরাং ঐগুলো সম্পর্কে দলিল অনুসন্ধানের প্রয়োজন কী? ঐগুলো সম্পর্কে ইসলামের মতামত হলো- ইসলাম ঐগুলোকে রহিত করেছে। সুতরাং ঐ ধর্মের বিধি বা কিতাব মোতাবেক মুসলমানদেরকে আমল করতে হবে না। অপরদিকে ইসলাম পরবর্তী কোন ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন না থাকার কারণ হিসেবে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর বাণী তুলে ধরা যায়। তিনি বলেন-

"আমার পর কোন নবী আসবে না।"

আর প্রত্যেক মুসলমানরেই বিশ্বাস যে তিনি হলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

"তিনি {হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)} নিজের মনগড়া কোন কথা বলেন না, তা তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহী বৈ কিছু নয়।" (সুরা নাজম - ৩-৪)

সুতরাং ইসলাম পরবর্তী কোন ধর্ম (যদি কেউ দাবী করে থাকে) সম্পর্কে কেনইবা আমরা দলিল অনুসন্ধান করব? কারণ তা তো কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েই আছে।

তবে এখন মুসলমানদের জন্য এ প্রশ্ন এসে দাড়ায় যে কোন পন্থায় সঠিকভাবে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) উপর অবতীর্ণ শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে? কারণ নবীর (সাঃ) রিসালাতের সময়কাল থেকে অনেক যুগ ও বর্ষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আর ইতিমধ্যেই নানা মাযহাব, ফেরকা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে কোনটি সঠিক? কারণ মুসলমানদের দায়িত্ব হলো সমস্ত হুকুম যেরূপে নাযিল হয়েছে সেরূপ আমল করা। কিন্ত কি করে একজন মুসলমান নিশ্চিত হবে যে, এ হুকুমগুলো ঠিক যে রকম নাযিল হয়েছে সেরকমই। কারণ, মুসলমানরা একাধিক দল ও মতে বিভক্ত, তাদের নামায একরকম নয়। তাদের এবাদত ও তাদের আচরণ বিভিন্ন। তাহলে তার কী করা উচিৎ? কোন পদ্ধতিতে সে নামায পড়বে? কোন পদ্ধতি সে অবলম্বন করবে তার এবাদত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে। যেমন- বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ক্রয়-বিক্রয়, ফৌজদারীবিধি, শাস্তি প্রদান, রক্তপণ ইত্যাদি।

একজন মুসলমানের জন্য এটা সঠিক নয় যে সে তার পূর্ব পুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবে কিংবা তার বন্ধু-বান্ধবকে অনুসরণ করবে। বরং (দায়িত্বের ক্ষেত্রে) তার ও তার নিজের মধ্যে যা কিছু আছে কিংবা তার ও তার মহান আল্লাহর মধ্যে যা কিছু আছে সে ব্যাপারে তাকে নিশ্চিত হতে হবে। এখানে পক্ষপাতিত্ব, কপটতা ও কুসংস্কারের কোন সুযোগ নেই বা কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়। তার জন্য তার দায়িত্বের বিষয়টি যৌক্তিকভাবে গ্রহণীয় হওয়া আবশ্যক, যাতে সে তার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা এবং তার প্রভুর প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। আর তখন আল্লাহ তাকে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে শাস্তি দিবেন না যখন সে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

"মানুষ কি মনে করে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।" (সুরা কিয়ামাহ - ৩৬)

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

"প্রকৃতপক্ষে, মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" (সুরা কিয়ামাহ - ১৪)

"নিশ্চয়ই এ কোরআন হলো স্মারক, যে কেউ ইচ্ছা করলে তার প্রভুর পথ বেছে নিতে পারে।" (সুরা মুজ্জাম্মিল - ১৯)

সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি একজন মুসলমান তার নিজেকে করতে পারে তা হলো- সে "আহলে বাইতের" পথ নির্বাচন করবে না অন্য কারো পথ? যদি আহলে বাইতের পথ বেছে নেয়, তবে তা কি দ্বাদশ ইমামীয়াদের পথটি সঠিক, না-কি এ ধরনের অন্য কোন ফেরকা? আর যদি আহলে বাইতের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ, যেমন- আহলে সুন্নতের পথ, বেছে নেয় তবে তাকে চার মাযহারের কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে, না কি অন্য কোন একটিকে? এ প্রশ্নগুলো সমস্ত মুক্ত চিন্তার অধিকারী মানুষের মধ্যেই জাগতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সঠিক কোন পথ খুঁজে পায়।

অতএব, আমাদের জন্য ইমামতের আলোচনা করা সমীচীন। যা দ্বাদশ ইমামীরা বিশ্বাস করে।

পর্ব-৩

ইমামত

২৩. ইমামত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামত হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের একটি যার উপর বিশ্বাস ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষ, আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষক কাউকেই অনুসরণ করা বৈধ নয় যদিও তারা উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। বরং এর উপর অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চালানো জরুরী। যেমন- তা জরুরী হলো তাওহীদ ও নবুওয়াতের ক্ষেত্রে।

ন্যূনতমপক্ষে, কারো উপর অর্পিত শরীয়তের কোন বিষয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে তার ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক বিশ্বাসের উপর। সুতরাং যদি কেউ মনে করে যে, ইমামতের ব্যাপারটি দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্গত নয়, তথাপি তাকে ইমামতের ধারণাকে পরীক্ষা করে নিতে হবে যদি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। কিন্তু কারো অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ধরে নিই যে আমরা সকলেই ইসলামী বিধান অনুসারে চলতে বাধ্য কিন্তু আমরা সঠিকভাবে সে হুকুমগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত নই। তবে ঐ সকল ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বস্ত কারো শরনাপন্ন হতে হবে যার ফলে আমরা এর (ভুল-ত্রুটি) দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। শীয়া মাযহাবের বিশ্বাস মোতাবেক বর্ণিত এমন ব্যক্তিবর্গ হলেন আহলে বাইতের ইমামগণ (আঃ)। আবার অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য কেউ।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নবুওয়াতের মতই ইমামতও হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও করুণা। সুতরাং প্রত্যেক যুগেই পথ প্রদর্শক ইমাম থাকা আবশ্যক যিনি মানুষের হেদায়াতকারী এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের সংবাদদাতা হিসেবে মহানবীর (সাঃ) প্রতিনিধিত্ব করবেন। মহানবী (সাঃ) সর্বসাধারণের উপর যেরূপ সার্বজনীন বেলায়াত বা কর্তৃত্ব করতেন তিনি সেরূপ কর্তৃত্ব করবেন জনগণকে যাবতীয় কল্যাণের

পথে পরিচালনা করার জন্য, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়-অত্যাচার নির্মূল করার জন্য এবং তাদের পারস্পরিক শত্রুতা দূর করার জন্য।

অতএব, ইমামত হলো প্রকারন্তরে নবুওয়াতের মিশনেরই ধারাবাহিকতা। নবী ও রাসূল প্রেরণ যে কারণে আবশ্যক ঠিক একই কারণেই রাসূলের পরে ইমাম নিযুক্ত করাও আবশ্যক। আর একারণেই আমরা বলি, ইমাম কেবলমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নবীর মাধ্যমে অথবা পূর্ববর্তী ইমামের মাধ্যমেই নিয়োগ লাভ করেন। মানুষের ইচ্ছা বা রায়ের কোন অধিকার এখানে নেই। সুতরাং বিষয়টি এমন নয় যে মানুষ যখন যাকে ইচ্ছে করবে তাকে ইমাম বানাবে, আবার যখন যাকে ইচ্ছে করবে তাকে প্রত্যাখান করবে। অনুরূপভাবে, তাদের পক্ষে ইমাম ব্যতীত টিকে থাকা সম্ভব নয়। মহানবী (সাঃ) থেকে এক মোস্তাফিজ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

“যদি কেউ তার যামানার (যুগের) ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।”

সুতরাং এমন কোন সময় থাকা সম্ভব নয় যখন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত কোন ইমাম থাকবেন না। এখন মানুষ তাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করুক বা না করুক, তাকে সাহায্য করুক বা না করুক, তাকে মান্য করুক বা না করুক, তিনি প্রকাশ্যে থাকুন বা লোক চক্ষুর আড়ালে থাকুন তাতে কিছু যায় আসে না। যদি মানুষের নিকট থেকে গুহায় এবং পাহাড়ী পথে আত্মগোপন করা মহানবীর (সাঃ) জন্যে সঠিক হয়, তবে ইমামের জন্যও তা সঠিক। অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ আত্মগোপন সুদীর্ঘ হোক বা নাতিদীর্ঘ হোক তাতে কোন তফাৎ নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

“প্রত্যেক জাতির জন্যেই রয়েছে পথ প্রদর্শক।” (সূরা রা'দ - ৮)

তিনি আরও বলেনঃ

“এমন কোন জাতি ছিলনা যেখানে সতর্ককারী ছিল না।”

(সুরা ফাতির - ২৪)

২৪. ইমামের পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামগণেরও (আঃ) নবীগণের (আঃ) মতই প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক। অনুরূপ তাঁরা সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধে। কারণ ইমামগণ (আঃ) হলেন শরীয়তের রক্ষাকারী ও প্রতিষ্ঠাতা, যেরূপ করেছিলেন নবী (সঃ)। যে কারণে নবীদের পবিত্রতায় বিশ্বাস করা আমাদের জন্য আবশ্যক ঠিক একই কারণে ইমামগণের (আঃ) পবিত্রতায় বিশ্বাস করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। আরবীতে একটা প্রবাদ আছে-

> **"আল্লাহর পক্ষে এটা অসম্ভব নয় যে তিনি সমস্ত গুণকে একজনের মধ্যে পুঞ্জীভূত করতে পারেন।"**

২৫. ইমামের জ্ঞান ও গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামেরও মহানবীর (সাঃ) মত বীরত্ব, মহত্ত্ব, আত্মসম্মান, সত্যবাদিতা, ন্যায় পরায়ণতা, বিচক্ষণতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতা ইত্যাদি পরিপূর্ণ গুণের ক্ষেত্রে সবার সেরা হওয়া আবশ্যক। আর এক্ষেত্রে নবীর (সাঃ) শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যে দলিল প্রযোজ্য ইমামের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যও সেই একই দলিল প্রযোজ্য।

ইমাম তাঁর শিক্ষা, ঐশী হুকুমসমূহ এবং সমস্ত জ্ঞান নবীর মাধ্যমে কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী ইমামের মাধ্যমে লাভ করে থাকেন। যদি কোন নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয় তবে তিনি তা আল্লাহ প্রদত্ত তার পবিত্র আত্মিক যোগ্যতার কারণে এলহামের মাধ্যমে জানতে পারেন। সুতরাং তিনি যখন কোন কিছুর প্রতি মনোনিবেশ করেন ও তার স্বরূপ উদঘাটন করতে প্রয়াসী হন তখন কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি ব্যতীতই ঐ বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত হন। আর এ জন্য তাঁকে কোন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল কিংবা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হয় না। তথাপি তাঁদের জ্ঞান ততোধিক বৃদ্ধি ও দৃঢ়করণ সম্ভব। (অর্থাৎ এমন নয় যে তাঁদের জ্ঞান এমন পর্যায়ে আছে যে আর বাড়তে পারে না।)

এ জন্যে মহানবী (সাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন-

> **"প্রভু হে! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"**

মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন ঘটনা অন্ততঃ দু'একবার ঘটে থাকে যে, সে তার অনুমান শক্তির মাধ্যমে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটিও এলহামের একটি অংশ। কারণ, মহান আল্লাহই তাকে এ শক্তি দিয়েছেন। আর এ অনুমান-শক্তি ব্যক্তিভেদে দুর্বল বা শক্তিশালী কিংবা কম বা বেশী হতে পারে। যাহোক এমন একটি মুহূর্তে মানুষের অন্তর এক ধরনের জ্ঞান লাভ করে থাকে। অথচ এজন্য তাকে চিন্তা, দলিলের অবতারণা কিংবা শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয় না। প্রত্যেকেই তার জীবনে অসংখ্যবার এ ধরনের সুযোগ লাভ করে। সুতরাং মানুষের পক্ষে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ উৎকর্ষে পৌছা সম্ভব। আর এ ব্যাপারে সমসাময়িক ও প্রাক্তন উভয় যুগের দার্শনিকগণ আলোচনা করেছেন।

সুতরাং আমরা মনে করি ইমাম এলহাম লাভের সর্বোচ্চ যোগ্যতায় পৌছে যান এবং আমরা বলি এটা আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি। ফলে তাঁর পবিত্র পরিশুদ্ধ আত্মার মাধ্যমে তিনি যে কোন অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। সুতরাং তিনি যখন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন ও সে সম্পর্কে জানতে চান তখন কোন প্রকার নাম ভূমিকা বা শিক্ষা ব্যতীতই তাঁর এ পবিত্র এলহাম শক্তির মাধ্যমেই ঐ বিষয়ে অবগত হন। তিনি যখন কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চান তখন তা তাঁর পবিত্র আত্মার উপর সুস্পষ্টরূপে আপতিত হয় যেমন আপতিত হয় নির্মল আয়নার উপর কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি। পবিত্র ইমামগণের (আঃ) জীবন ইতিহাস থেকে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখতে পাই যে, মহানবীর (সাঃ) মত ইমামগণও আশৈশব জীবনের কোন সময়ই কারো নিকট প্রশিক্ষণ লাভ করেননি, কোন শিক্ষকের শরণাপন্ন হননি- এমনকি লেখাপড়াও করেননি। তাঁদের জীবনে এমন কোন লেখক ও শিক্ষক দেখা যায় না যে তাঁদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন। অথচ তাঁরা হলেন পৃথিবীতে সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং অতুলনীয়। সুতরাং তাঁদের জীবনে এমন কোন প্রশ্ন আসেনি যার তাৎক্ষনিক জবাব তারা দেননি। তাঁরা কখনো "জানিনা" কথাটি উচ্চারণ করেননি। এমন কোন প্রশ্ন ছিল না যার জন্যে তাঁরা কালক্ষেপণ করেছিলেন কিংবা চিন্তার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

অপরদিকে এমন কোন ইসলামী পন্ডিত বক্তা কিংবা বিশেষজ্ঞ খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তার জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি পড়ালেখা করেননি কিংবা কোন পন্ডিতের নিকট জ্ঞানার্জন করেননি অথবা কোন

বিষয়ের জ্ঞানে তার কোন সন্দেহ নেই। কারণ মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি এরকমই।

২৬. ইমামগণের আনুগত্য সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামগণ (আঃ) হলেন সেই কর্তৃপক্ষ যাঁদের আনুগত্য করা মহান আল্লাহ আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন। তাঁরা মানুষের জন্য সাক্ষী। তাঁরা হলেন আল্লাহর পথের দ্বার স্বরূপ ও পথ নির্দেশক। তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানের সংরক্ষক, ওহীর ব্যাখ্যাকারী, তাওহীদের স্তম্ভ, তাঁর মারেফাতের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরা পৃথিবীর মানুষের নিরাপত্তা বিধায়ক। যেমন- নক্ষত্ররাজি আকাশবাসীর নিরাপত্তা বিধায়ক, যা মহানবীর (সাঃ) বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি। মহানবী (সাঃ) আরও বলেন-

> **"তাঁদের উপমা, এ উম্মতের জন্য নূহের কিস্তির মত, যে কেউ এতে আরোহন করল মুক্তি পেল, আর এর অন্যথাকারীরা নিমজ্জিত হলো।"**

অনুরূপ, পবিত্র কোরআনে এ উক্তির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই যে, ইমামগণ (আঃ) হলেন-

> **"সম্মানিত বান্দা যারা তাঁর অগ্রে কোন কথা বলেন না এবং তাঁরা তাঁর (আল্লাহর) আদেশ (উত্তমরূপে) সম্পাদন করেন।"** (সূরা আম্বিয়া - ২৭)

তাঁরা হলেন সেই ব্যক্তিবর্গ যাঁদের সকল অপবিত্রতা দূর করে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে পবিত্রের মত পবিত্র করে দিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁদের আদেশ হলো মহান আল্লাহরই আদেশ, তাঁদের নিষেধ হলো মহান আল্লাহরই নিষেধ, তাঁদের আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য, তাঁদের অবাধ্যতা আল্লাহরই অবাধ্যতা, তাঁদের বন্ধু হওয়া আল্লাহরই বন্ধু হওয়া, তাঁদের শত্রু হওয়া আল্লাহরই শত্রু হওয়া। তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। মূলতঃ তাঁদেরকে অস্বীকার করার মানে হলো আল্লাহর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করা। আর আল্লাহর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার মানে হলো মহান আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করা। সুতরাং তাঁদের নিকট আত্মসমর্পণ করা, তাঁদের আদেশ মেনে চলা ও তাঁদের কথা অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক।

আর এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল ঐশী নির্দেশই তাঁদের শিক্ষা থেকে গ্রহণ করতে হবে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে তা গ্রহণ করা যাবে না। তাঁদের ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সমর্পিত হলে দ্বীনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। কেউই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না যে মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছে কিংবা সঠিকরূপেই দায়িত্ব পালন করেছে। সেই নূহের তরীর মতই যে কেউ তাতে আরোহন করবে সে মুক্তি পাবে আর যে কেউ তা ত্যাগ করবে সে সন্দেহ, অজ্ঞতা, মিথ্যাচার ও বিরোধের ক্রুদ্ধ তরঙ্গের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

অদ্য ইমামতের উপর আলোচনার উদ্দেশ্য আহলে বাইত (আঃ) যে বৈধ খলিফা বা ঐশী নেতৃত্ব তা প্রমাণ করা নয়। কারণ, ইতিহাসের স্কন্ধে ভর করে যা অতীত হয়ে গিয়েছে তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিংবা প্রকৃত হকদারের অধিকার ফিরিয়েও দেয়া যাবে না। বরং ঐশী আদেশ নিষেধের জন্য আহলে বাইতের (আঃ) শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতাকে প্রতিপাদন করাই আমাদের প্রয়াস। আর সেই সাথে মহানবী (সাঃ) প্রকৃতপক্ষে যা বলেছেন তা খুজে বের করার চেষ্টা করছি।

যারা ইমামগণ (আঃ) কর্তৃক প্রশিক্ষিত হয়নি কিংবা তাঁদের আলোয় যাদের অন্তর আলোকিত হয়নি প্রকৃতার্থে তারা ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। আর সে ক্ষেত্রে কেউ আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ, শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে বিভিন্নদল ও গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান আপোষহীন বিরোধের ফলে কারো জন্য এ অবকাশ থাকে না যে, কোন এক মাযাহাবকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবে। সুতরাং কোন মাযহাবের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং নিশ্চিতরূপে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া ব্যতীত তার কোন উপয়ান্তর নেই। শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তা সম্পাদন করা আবশ্যক। আবার নিশ্চিত দায়িত্ব আসলে নিশ্চিত কর্তব্য সম্পাদন আবশ্যক।

আহলে বাইতের (আঃ) শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা এবং মহানবীর (সাঃ) পর তাঁরাই যে আল্লাহর বিধানের প্রকৃত উৎস সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত দলিল বিদ্যমান। ন্যূনতমপক্ষে মহানবীর (সাঃ) বক্তব্যই

এক্ষেত্রে উত্তম উপস্থাপনা- শিয়া ও সুন্নী উভয়ই এ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে একমত-

> **"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমি দু'টি ভারীবস্তু রেখে যাচ্ছি যার একটি আরেকটি অপেক্ষা বেশী ভারী। একটি হলো আল্লাহর কিতাব যা আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশির মত। আর অপরটি হলো আমার এতরাত- আহলে বাইত। হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যে কেউ এঁকে আঁকড়ে ধরবে কখনোই আমার পরে সে পথভ্রষ্ট হবে না।"**

যদি এ মূল্যবান হাদীসের প্রতি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমরা এর অপরূপ অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হব। কারণ, সর্বপ্রথম তা বলছে ঃ

> **"যদি তুমি এতদ্বয়কে আঁকড়ে ধর তবে আমার পরে কখনোই বিচ্যুত হবে না।"**

আর আমাদের নিকট রেখে যাওয়া হয়েছে দু'টি ভারী বস্তু একই সাথে যেন একই বস্তুরূপে -এর কোন একটিকে আঁকড়ে ধরা যথেষ্ট নয়। কারণ তাদেরকে কেবলমাত্র একত্রে ধরে রাখলেই আমরা কখনো পথভ্রষ্ট হব না। ঐটা আরও সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় এ কথায় যে, **'হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কখনোই পৃথক হবে না।'** সুতরাং যদি কেউ এতদ্বয় থেকে দূরে থাকে এবং এ গুলোকে আঁকড়ে না ধরে সে কখনোই হেদায়াত প্রাপ্ত হবে না। অনুরূপ, তাঁরা হলেন **'নাজাতের তরী'**- পৃথিবীবাসীর রক্ষাকারী। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে সে গোমরাহীর উত্তাল তরঙ্গে নিমজ্জিত হবে এবং সে ধ্বংস থেকে নিস্তার পাবে না।

সুতরাং এটা বলা সঠিক নয় যে, এ হাদীসের অর্থ হলো, আহলে বাইতকে (আঃ) আন্তরিক ভাবে ভালবাসা, তাঁদেরকে অনুসরণ করা বা মান্য করা শর্ত নয়। মূর্খ ব্যতীত কেউই একথা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ এটা হলো সুস্পষ্ট আরবীর বিকৃত অর্থ।

২৭. আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

পবিত্র কোরআনের সূরা শুরা-র ২৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

"বলুন আমি তোমাদের নিকট আমার নিকটাত্মীয়দের সৌহার্দ ব্যতীত কিছুই চাই না।"

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহানবীর (সাঃ) আহলে বাইতকে (আঃ) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখার পাশাপাশি দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাঁদের প্রতি ভালবাসা ও মাওয়াদ্দাত রাখা আবশ্যক। কারণ মহান আল্লাহ প্রাগুক্ত আয়াতে মানুষের জন্যে এটা বাধ্যতামূলক করেছেন।

মহানবীর (সাঃ) থেকে বর্ণিত এক বহুল আলোচিত হাদীসে বলা হয়-

"নিশ্চয়ই আহলে বাইতের (আঃ) প্রতি ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ, আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ হলো শঠতা বা মোনাফেকীর লক্ষণ। নিশ্চয়ই যে তাঁদেরকে ভালবাসে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেও ভালবাসে এবং যদি কেউ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

সুতরাং তাঁদের প্রতি ভালবাসা ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের (নামায, যাকাত ইত্যাদির ন্যায়) অন্তর্ভূক্ত। এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। বিভিন্ন মাযহাব ও গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধ থাকলেও এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। তবে নাসেবী নামে খ্যাত ক্ষুদ্র একটি দল আছে যারা আহলে বাইতের (আঃ) প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা যে ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয় তা স্বীকার করে না। আর যেহেতু নামায, যাকাত ইত্যাদির মত ইসলামের সন্দেহাতীত আবশ্যকীয় বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার অর্থ প্রকারান্তরে মূল রেসালাতকে অস্বীকার করা সেহেতু প্রকৃতই তারা রেসালাতকে অস্বীকারকারী যদিও বাহ্যিকভাবে মুখে তারা শাহাদাতাইন বলে থাকে। আর এ কারণে আহলে বাইতের (আঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মোনাফেকীর লক্ষণ। আর তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা ঈমানের লক্ষণ। ফলে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ মহব্বত ও অভিভাবকত্বের যোগ্য ব্যক্তি বিশেষ ব্যতীত আর কারো মহব্বত ও মাওয়াদ্দাত আবশ্যক করেন নি। কারণ তাঁরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা, আল্লাহ নিকট রয়েছে তাঁদের মর্যাদা। তাঁরা শিরক, পাপাচার এবং যাবতীয় বিষয় যা কিছু আল্লাহর তুষ্টি ও করুণা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা থেকে পবিত্র। আর এটা কখনোই সম্ভব

নয় যে তিনি এমন কারো আনুগত্যকে আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করবেন যারা গুনাহে লিপ্ত হয়, তাঁর আনুগত্য করে না, যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত নয়। সমস্ত মানুষই তাঁর বান্দা এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে সমান। মানুষের মধ্যে একমাত্র যে যত বেশী তাকওয়ার অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে সে তত বেশী মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তিনি যদি কাউকে ভালবাসতে আদেশ দেন, তবে অবশ্যই ঐ ব্যক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু ও সবদিক থেকে উত্তম। নতুবা কেউ ভালবাসার জন্যে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব পেত না। কিংবা মহান আল্লাহ কারো জন্যে কারো ভালবাসা আবশ্যক করতেন না। যদি তা করতেন তবে বেলায়াত অসার ও খেলনারূপে পর্যবসিত হত। এর কোন মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব থাকত না।

২৮. ইমামগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ঃ

ইমামগণের (আঃ) প্রতি আমাদের বিশ্বাস গোল্লাত (তাঁদের মর্যাদার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িকারী) ও হুলুলিদের (তাঁদের মধ্যে আল্লাহর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এরূপ বিশ্বাসী) মত নয়। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

"... কত গুরুতর তাদের মুখের কথা।" (সুরা কাহফ - ৫)

বরং আমাদের বিশ্বাস হলো স্বতন্ত্র। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁরা (আঃ) আমাদের মতই মানুষ -আমাদের যা আছে তাঁদের তা আছে, আবার তাঁদের যা আছে আমাদেরও তা আছে। তথাপি তাঁরা হলেন মর্যাদাবান, মহান আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য করেছেন, দিয়েছেন বেলায়াত। কারণ তাঁরা জ্ঞান, তাকওয়া, সাহসিকতা, আত্মসম্মান, সকল সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসিত গুণে সকল মানুষের সেরা এবং পরিপূর্ণ। এ সকল দিক থেকে কেউই তাঁদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। সুতরাং ইমামতের ক্ষেত্রে তাঁরাই যোগ্যতম ব্যক্তি। হেদায়াতকারী হিসেবে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনার ক্ষেত্রে, কোরআন ও দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মহানবীর (সাঃ) পর তাঁরাই বিশ্ববাসীর জন্যে আশ্রয়স্থল। আমাদের ষষ্ঠ ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন-

> **"আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা যদি সৃষ্টির জন্য অসম্ভব না হয়ে থাকে যদিও তুমি তা জান না বা বুঝ না তাকে প্রত্যাখ্যান করোনা বরং তা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। আর যদি সৃষ্টির জন্য সম্ভব নয় এমন কিছু আমাদের সম্পর্কে বলা হয়, তবে তা প্রত্যাখ্যান কর এবং আমাদের উপর আরোপ করো না।"**

২৯. ইমাম নিয়োগ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, নবুওয়াতের মত ইমামতও রাসূল কিংবা নিযুক্ত কোন ইমামের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামত নবুওয়াতের মতই। এক্ষেত্রে কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং যাকে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক নেতারূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর সম্পর্কে বাদানুবাদ করা সমীচীন নয়। অনুরূপ তাঁকে নির্বাচন, নির্ধারণ বা নিয়োগ দানের অধিকারও মানুষের নেই। কারণ যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার অধিকারী হবেন এবং মানুষের হেদায়েত ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার অধিকারী হবেন তাঁকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত কেহই পরিচিত করিয়ে দিতে পারে না। কিংবা নিয়োগ ও অনুমোদন দিতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহানবী (সাঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী ও ইমামের নাম ঘোষনা করেছিলেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁরই চাচাত ভাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (আঃ) কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি হলেন মহানবীর (সাঃ) পর মুমিনদের আমীর, ওহীর অভিভাবক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের ইমাম। তাঁর নিয়োগ এবং আমীরুল মুমিমীন হিসেবে তাঁর প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছে ঐতিহাসিক গাদীর দিবসে। মহানবী (সাঃ) সেদিন বলেছিলেন-

> **"হে মুমিনগণ! আমি যার মাওলা (অভিভাবক) এ আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ বন্ধু হও তার যে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করে, শত্রু হও তার যে তাঁর সাথে শত্রুতা করে, সাহায্য কর তাকে যে তাঁকে সাহায্য করে, লাঞ্ছিত কর তাকে যে তাঁকে লাঞ্ছনা দেয় এবং সত্যকে সর্বদা তাঁর (আলীর) সাথে রাখ।"**

হযরত আলীর (আঃ) ইমামত ও বেলায়াতের কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল সেদিন, যেদিন সকল নিকট-আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) সেদিনও ঘোষণা করেছিলেন-

> **"তিনি (আলী) আমার ভাই, উত্তরাধিকারী (ওয়াসী) এবং আমার পরে আমার প্রতিনিধি। সুতরাং তোমরা তাঁর কথা মেনে চলবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে।"**

মহানবী (সাঃ) যখন তাঁকে একথা বলেছিলেন তখন হযরত আলী (আঃ) কিশোর ও অপরিণত বয়সের ছিলেন।

মহানবী (সাঃ) আলীর (আঃ) উত্তরাধিকারীর ব্যাপারটি একাধিকবার ঘোষণা করেছিলেন। যেমন বলেছিলেন-

"তুমি আমার নিকট সেরূপ, যেরূপ মূসার নিকট হারুন। তবে আমার পরে কোন নবী আসবে না।"

হযরত আলীর (আঃ) বেলায়াতের প্রমাণস্বরূপ হাদীস ব্যতীত একাধিক আয়াতও বিদ্যমান। যেমন- পবিত্র কোরআনে সুরা মায়েদা-র ৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে -

"নিশ্চয়ই তোমাদের ওয়ালী হলেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যাঁরা ঈমান এনেছে, যাকাত দিয়েছে রুকু অবস্থায়।"

উপরোক্ত আয়াতের সর্বশেষ অংশ নাযিল হয়েছিল হযরত আলী (আঃ) প্রসংগে যিনি রুকু অবস্থায় তাঁর আংটি ভিক্ষুককে প্রদান করেছিলেন। ইমামতের স্বপক্ষে যে সকল আয়াত, রেওয়ায়েত এসেছে তার সবগুলো বর্ণনা করা কিংবা সেগুলো সম্পর্কে যুক্তির অবতারণা করা এ পুস্তিকার ক্ষুদ্র কলেবরে অসম্ভব।

৩০. ইমামগণের (আঃ) সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইমামগণ যাঁদের সত্যিকার অর্থে ইমামত্বের বৈশিষ্ট্য আছে এবং যাঁরা মহানবীর (সঃ) পর আমাদের জন্য শরীয়তের আহকামের উৎসরূপে আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনয়ন লাভ করেছেন তাঁরা হলেন বারজন। মহানবী (সঃ) তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ পূর্বক মনোনয়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁদের অগ্রজ ঘোষণা দিয়েছিলেন অনুজের। আর তা নিম্নরূপ ঃ

কিতাবুস সকিফা দ্রষ্টব্য। উক্ত কিতাবে লেখক এতদসম্পর্কিত কোরআনের আয়াত ও রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। যাহোক ইমাম আলী (আঃ) ইমাম হাসান ও হোসাইন (আঃ) এর ইমামত ঘোষণা করেছিলেন এবং ইমাম হোসাইন (আঃ) তাঁর পুত্র আলী জয়নুল আবেদীনের ইমামত ঘোষণা করেছিলেন। অনুরূপ শেষ ইমাম পর্যন্ত প্রত্যেক ইমামই তাঁর পূর্বতন ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ইমাম সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীতে আসছে।

১। আবুল হাসান আলী ইবনে আবি তালিব (আল-মুর্তাজা) যাঁর জন্ম ২৩ হিজরী পূর্বাব্দ এবং হিজরী ৪০ সালে শাহাদাৎ বরণ করেন।

২। আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইবনে আলী (আযযাকি) (২হিঃ - ৫০ হিঃ)

৩। আবু আব্দুল্লাহ্ আল হুসাইন ইবনে আলী (সাইয়্যেদুশ শোহাদা) (৩ হিঃ - ৬১ হিঃ)

৪। আবু মোহাম্মদ আলী ইবনিল হুসাইন (যয়নুল আবেদীন) (৩৮ হিঃ - ৯৫হিঃ)

৫। আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী (আল বাকের) (৫৭ হিঃ - ১১৪ হিঃ)

৬। আবু আব্দুল্লাহ্ জাফর ইবনে মোহাম্মদ (আস-সাদিক) (৮৩ হিঃ - ১৪৮ হিঃ)

৭। আবু ইব্রাহিম মূসা ইবনে জাফর (আল কাযিম) (১২৮ হিঃ - ১৮৩ হিঃ)

৮। আবুল হাসান আলী ইবনে মূসা (আর রেযা) (১৪৮ হিঃ - ২০৩ হিঃ)

৯। আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী (আল জাওয়াদ) (১৯৫ হিঃ - ২২০ হিঃ)

১০। আবুল হাসান আলী ইবনে মোহাম্মদ (আল-হাদী) (২১২ হিঃ - ২৫৪ হিঃ)

১১। আবু মোহাম্মদ আল হাসান ইবনে আলী (আল আসকারী) (২৩২ হিঃ - ২৬০ হিঃ)

১২। আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইবনিল হাসান (আল মাহদী) (২৫৬ হিঃ -...........)

আর সর্বশেষ ইমামই হলেন আমাদের সময়কালের ইমাম যিনি অন্তর্ধানে রয়েছেন, আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষামান, মহান আল্লাহ তাঁর আবির্ভাব তরান্বিত ও সহজ করুন যাতে তিনি পৃথিবীতে সেরূপে ন্যায়-নীতিতে পরিপূর্ণ করে দিতে পারেন, যেরূপে পৃথিবী জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

৩১. ইমাম মাহদীর (আঃ) প্রতি আমাদের বিশ্বাস ঃ

নিশ্চয়ই ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের সুসংবাদ মহানবীর (সাঃ) হাদীস থেকে তাওয়াতুর রূপে প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম মাহদী (আঃ) হবেন হযরত ফাতেমা যাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার রক্তজ সন্তানের অন্তর্ভূক্ত। তিনি পৃথিবীকে সেরূপ ন্যায়-নীতিতে পূর্ণ করে দিবেন যেরূপ পৃথিবী অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভাষার পার্থক্য থাকলেও মুসলমানদের সকল মাযহাব সামগ্রিকভাবে ইমাম মাহদীর (আঃ) সুসংবাদ সম্পর্কে একমত। এটা শীয়া মাযহাব কর্তৃক উদ্ভাবিত কোন নতুন চিন্তা নয়। অত্যাচার ও জুলুম থেকে নিস্তার পাওয়ার আকাঙ্খী কারো স্বপ্নও নয় যেমনটি কোন কোন পক্ষপাতদুষ্ট কুতার্কিক বলে থাকে। বরং ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের বিষয়টি মহানবীর (সাঃ) বর্ণনা থেকে স্পষ্ট রূপে মুসলমানদের অন্তরে প্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সকল মুসলমান এতে বিশ্বাসী। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই একদল লোক নিজেকে মাহদী হিসেবে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল। এদের মধ্যে কিসানিয়াহ, আব্বাসীয়গণ এবং একদল আলাভীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা এ প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে প্রথিত বিশ্বাসকে ভ্রান্তিতে পতিত করে ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সুতরাং 'মাহদীর' মিথ্যা দাবী তুলে তারা সাধারণের উপর প্রভাব খাটাতে চেয়েছিল। (কারণ মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের ব্যাপারটি সর্বজন স্বীকৃত)

আমরা দ্বীন ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পাশাপাশি বিশ্বাস করি যে, এ দ্বীন সর্বশেষ দ্বীন এবং মানব জাতির সংস্কারের জন্য অন্য কোন দ্বীন আসবে না। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই যে, ন্যায় ও কল্যাণকর্মের অভাবে জুলুম ও অত্যাচার ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। অথবা আমরা আরো দেখতে পাই যে, মুসলমানরা স্বয়ং ইসলামের নিয়ম নিজেদের দেশেই উপেক্ষা করে চলছে। তারা এমনকি একহাজার ইসলামী বিধানের মধ্যে একটি বিধানও পালন করে না। তথাপি আমরা পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জুলুম ও অত্যাচারে নিমজ্জিত এ বিশ্বের সংস্কারের আশায় অপেক্ষমান।

প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি ইসলামী বিধানের বিকৃতি ও মুসলমানদের চিন্তা চেতনার মধ্যে যে পারস্পরিক ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি

হয়েছে তাতে স্বীয় শক্তি ও আধিপত্য নিয়ে ইসলামের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। প্রকৃতার্থেই ইসলাম কখনো সশক্তিতে ফিরে আসবে না যদি না কোন মহান সংস্কারক আবির্ভূত হন এবং ঐশী অনুগ্রহ ও দিক নির্দেশনায় মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ইসলামের সাথে মিশে যাওয়া ভুল-ক্রটি ও বিচ্যুতিকে দূর করেন। নিশ্চিতরূপে ঐ মহান সংস্কারকের থাকবে সুমহান মর্যাদা, সর্বময় কর্তৃত্ব, অলৌকিক শক্তি যার মাধ্যমে তিনি জুলুম ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায় ও সাম্যে পরিপূর্ণ করে দিবেন।

সংক্ষেপে পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, বিশ্বমানবতা আজ অত্যাচারে নিদারুণ ভাবে বিপর্যস্ত। এ দ্বীনই সঠিক দ্বীন ও সর্বশেষ দ্বীন -এ বিশ্বাসের দাবী আমাদেরকে এমন এক সংস্কারকের (আল-মাহদী) জন্য অপেক্ষমান থাকার জন্য আশান্বিত করে যিনি পৃথিবীকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন। মুসলমানদের সমস্ত মাযহাবই এ অপেক্ষায় বিশ্বাস করে। এমনকি অমুসলিম সম্প্রদায়ও এতে বিশ্বাসী। ইমামীয়াদের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য শুধু এখানেই যে ইমামীয়ারা বিশ্বাস করে যে, এ সংস্কারক হলেন মাহদী (আল্লাহর তাঁর আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করুন)। তাদের বিশ্বাস তিনি ২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এখনও বেঁচে আছেন। তিনি ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) সন্তান যার নাম 'মোহাম্মাদ'। মহানবী (সাঃ) ও আহলে বাইতের (আঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে তাঁর জন্ম ও আত্মগোপনের ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে।

কোন কালে বা যুগেই ইমামতের এ মিশন ব্যাহত হবে না যদিও ইমাম লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুত দিন ব্যতীত আত্মপ্রকাশ করবেন না। আর সেই প্রতিশ্রুত দিবস একমাত্র মহান আল্লাহরই জানা। কারণ এটি এক ঐশী রহস্য।

এত সুদীর্ঘ সময় ধরে ইমামের বেঁচে থাকা এবং সুদীর্ঘ জীবন মোজেযা বহির্ভূত কোন কিছুই নয় যা মহান আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারণ করেছেন। এটা ঐ মোজেযা হতে বড় কিছু নয় যে, তাঁর পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা মহান আল্লাহর নিকট চলে যাবার পর তিনি বিশ্বমানবতার জন্য ইমাম নিযুক্ত হন। এটা (তাঁর দীর্ঘজীবন লাভ) তাঁর ইমাম হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির চেয়ে বেশী আশ্চর্যের বিষয় নয়। এটা ঈসার (আঃ) মোজেযা থেকে

বেশী কিছু নয় যে শিশু বয়সে দোলনায় থেকে তিনি মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন এবং নবীরূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দীর্ঘজীবি হওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব নয় বা চিকিৎসা বিজ্ঞান একে অস্বীকার করে না। যদিও আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের দীর্ঘজীবিতার ক্ষেত্রে এখনও অক্ষম। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে অপারগ হলেও মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তদুপরি নূহের (আঃ) সুদীর্ঘ জীবন লাভ এবং ঈসার (আঃ) এখনও জীবিত থাকার কথা পবিত্র কোরআন থেকে আমরা জানতে পারি। আর যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কোরআনের অবিকৃত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে তবে ইসলামকে সে চিরবিদায় জানাল। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে মুসলমান নিজেকে কোরআনে বিশ্বাসী বলে দাবী করছে অথচ এর সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে।

এখানে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম মাহদীর (আঃ) জন্য অপেক্ষামান থাকার অর্থ এ নয় যে, মুসলমানরা তাদের ধর্ম বিষয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এবং তাদের জন্যে দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসা ও দ্বীনের পথে জিহাদ করা কিংবা দ্বীনের আহকাম পালন করা অথবা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বারণ করা আবশ্যক নয়। বরং মুসলমানরা সব সময়ই দ্বীনের আহকাম পালন করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। তার জন্য আবশ্যক হলো সঠিক পন্থায় সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা চালানো। তার জন্য আবশ্যক হলো যতটুকু সম্ভব সৎ কাজের আদেশ করণ ও অসৎ কাজের নিষেধকরণ।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

"তোমরা সকলেই পথ নির্দেশক আর সকলেই নিজ নিজ জাতির উপর দায়িত্বশীল।"

অতএব, কেবলমাত্র মাহদীর (আঃ) জন্য অপেক্ষমান থেকে সকল দ্বীনী দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন থাকা মুসলমানদের জন্যে সমীচীন নয়। এর ফলে মুসলমানের দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না কিংবা দায়িত্ব স্থগিত হয় না এবং পশুর মত মানুষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন নয়।

৩২. রাজআত (পুনরাগমন) সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

এ ক্ষেত্রে শিয়ারা তা-ই বিশ্বাস করে যা রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইত (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনা মতে মহান আল্লাহ একদল মৃতব্যক্তিকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন পূর্বে ঠিক যে অবস্থায় তারা ছিল সে অবস্থায়। তখন মহান আল্লাহ একদলকে সম্মানিত করবেন এবং অপর দলকে লাঞ্ছিত করবেন। তিনি সৎ কর্ম সম্পাদনকারীকে অসৎ কর্ম সম্পাদনকারীদের থেকে পৃথক করে দিবেন, পৃথক করবেন অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারীকে। আর ইমাম মাহদীর (সাঃ) আবির্ভাবের পর এ ঘটনা ঘটবে।

কাজেই পুনরাবর্তন ঘটবে না যদি না সে ঈমানের চুড়ান্ত শিখরে পৌঁছে কিংবা অনাচারের নিকৃষ্টতম স্তরে তলিয়ে যায়। এরপর তারা পুনরায় মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর তাদেরকে বিচার দিবসে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং যার যার প্রাপ্তি অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। এ কারণে পবিত্র কোরআনে যারা পৃথিবীতে দু'বার প্রত্যাবর্তন করেছিল তৃতীয়বার আসার জন্য তাদের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

> **"তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। আমরা আমাদের দোষ স্বীকার করছি। সুতরাং এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি?"**
> (সুরা মুমিন - ১১)

হ্যাঁ, পবিত্র কোরআনে এ পৃথিবীতেই রাজআত বা পুনরাবর্তনের সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য এসেছে। এছাড়া পবিত্র আহলে বাইত (আঃ) থেকেও এ সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা এসেছে। শীয়াদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত সকলেই এ ব্যাপারে একমত। শীয়াদের ঐ ক্ষুদ্রাংশের মতে রাজআতের অর্থ হলো অপেক্ষমান ইমামের (আঃ) ফিরে আসার মাধ্যমে আহলে বাইতের (আঃ) নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং আদেশ নিষেধের অধিকার ফিরে আসা। লোকদের প্রত্যাবর্তন বা মৃত্যুর পর পূর্নজীবন লাভ নয়।

রাজআতের ব্যাপারটি আহলে সুন্নত কর্তৃক অস্বীকৃত হয়ে আসছে। তাদের মতে এটা হলো ধর্ম বিরোধী বিশ্বাস। তাদের হাদীস সংকলনকারীরা রাজআত সম্পর্কে বর্ণনাকারী রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারী) উপর দূর্নাম দিয়েছেন যাতে করে তাদের বর্ণনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়। এমনকি তারা

রাজআতে বিশ্বাসকারীদেরকে কাফের ও মোনাফেক অথবা তদপেক্ষা কুৎসিত কোন অ্যাখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। সুন্নি কর্তৃক শীয়ারা ধিকৃত ও নিন্দিত হওয়ার একটি বড় কারণ হলো রাজআতের এ বিশ্বাস।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের ব্যাখ্যা হলো সেই অস্ত্র যা পূর্বে বিভিন্ন ইসলামী দলগুলো পরস্পরকে অপবাদ দিতে ব্যবহার করত এবং যা নিয়ে বিবাদ করত। প্রকৃতপক্ষে পরস্পরকে দোষারোপ করার কোন কারণই আমরা দেখি না। কারণ, রাজআতের প্রতি বিশ্বাস না তাওহীদের বিশ্বাসকে খর্ব করে, আর না নবুওয়াতের বিশ্বাসকে। বরং এগুলোর সত্যতার উপর গুরুত্বারোপ করে। কেননা রাজআত হলো পুনরুত্থান দিবসের মতই মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ। এটি হলো মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর আহলে বাইতগণের (আঃ) অনুসৃত মোজেযা (অলৌকিক ঘটনা) কিংবা ঈসা (আঃ) কর্তৃক মৃতকে জীবিতকরণের মোজেযার মত বরং তার চেয়েও বড়। কারণ, পচে গলে যাওয়া লাশকে জীবিত করা হয়। পবিত্র কোরআনের ভাষায়-

> **"বলে যে, কে নষ্ট হয়ে যাওয়া হাড়গুলোতে প্রাণ সঞ্চার করবে? বলুন, তিনিই যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"** (সুরা ইয়াসীন - ৭৯)

তবে যারা রাজআতকে অসার পুনর্জন্মবাদ (তানাসুখ) মনে করে অভিযোগ তুলছে তারা প্রকৃত পক্ষে এ তানাসুখ এবং শারীরিক পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে নি। আর রাজআত হলো শারীরিক পুনরুত্থানের অনুপ্রকরণ। অপরদিকে তানাসুখ হলো পূর্বের দেহ ব্যতিরেকে অন্য কোন দেহে প্রত্যাবর্তন। অথচ শারীরিক পুনরুত্থানের অর্থ স্বতন্ত্র। কারণ, এর মানে হলো পূর্বতন দেহে আত্মার প্রত্যাবর্তন। আর এরূপই হলো রাজআত বা পূনর্জীবন লাভ। যদি রাজআত তানাসুখ হয়, তবে ঈসা (আঃ) কর্তৃক মৃতকে জীবন দানও তানাসুখ হবে। তদ্রুপ, যদি রাজআত তানাসুখ হয়, তবে দৈহিক পুনরুত্থানও তানাসুখ হবে।

এখন রাজআতের উপর দুটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমত ঃ** এটা ঘটা অসম্ভব এবং **দ্বিতীয়ত ঃ** রাজআত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো সঠিক নয়।

বর্ণিত সমস্যা দু'টিকে সঠিক ধরে নিলেও রাজআতের প্রতি বিশ্বাস এতটা ঘৃণ্য নয় যা শিয়াদের শত্রুরা মনে করে থাকে। মুসলমানদের অন্যান্য

দলগুলোর এমন কত বিশ্বাস আছে যা অসম্ভব কিংবা যা সঠিক উৎস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। অথচ এর কারণে কাফের বা ইসলাম থেকে বের করে দেয়া আবশ্যক হয়নি। আর এগুলোর উদাহরণও কম নয়। যেমন ঃ নবী কর্তৃক ভুল-ক্রটি ও পাপ হওয়া, কোরআন অনাদি হওয়া, কিংবা এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ যখন বললেন যে তিনি শাস্তি দিবেন, তখন তিনি তা করতে বাধ্য। অথবা মহানবী (সাঃ) তাঁর উত্তরসূরী নির্বাচন করেন নি ইত্যাদি।

যাহোক প্রাগুক্ত সমস্যাদ্বয়ের সত্যতার কোন ভিত্তি নেই। 'রাজআত অসম্ভব' এর জবাবে আমরা বলব- ইতিপূর্বে আমরা বলেছিলাম যে, রাজআত হলো দৈহিক পনুরুত্থানের প্রকরণ। পার্থক্য শুধু এটুকু যে তা ইহকালেই হবে। সুতরাং সেই কিয়ামতের সম্ভাবনার দলিলই রাজআতকে প্রমাণিত করে। এখানে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এটুকু যে, পার্থিব জীবনে আমরা এতে অভ্যস্ত নই। আমরা এর সংঘটিত হওয়ার কোন কারণ বা অন্তরায় সম্পর্কে জানিনা যে তা আমাদের একে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার কাছাকাছি পৌঁছে দিবে। অপরদিকে মানুষের প্রকৃতি এরকম যে, সে যাতে অভ্যস্ত নয় বা যার সাথে পরিচিত নয় তা গ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এটা সে রকম যে একদল কিয়ামত সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিল -

"কে এ নষ্ট হাড়গুলোকে জীবন দিবে?" (সুরা ইয়াসিন - ৭৮)

জবাবে বলা হয়েছিল ঃ

"যিনি প্রথমবার একে সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই একে জীবন দিবেন এবং তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" (সুরা ইয়াসিন - ৭৯)

এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে রাজআতকে বিশ্বাস করার বা অগ্রাহ্য করার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল না থাকে কিংবা শুধু খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আমরা বলে থাকি এর কোন দলিল নেই, সেখানে আমাদেরকে ওহীর উৎস থেকে প্রাপ্ত দলিলসমূহের শরণাপন্ন হতে হবে। পবিত্র কোরআনে কোন কোন মৃতব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে রাজআত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ মেলে। যেমন- হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এসেছে -

"আমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে অন্ধকে আলো দেই, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করি আর মৃতকে জীবিত করি।" (সুরা আলে ইমরান - ৪৯)

অনুরূপ, মহান আল্লাহর বাণী-

"কিরূপে আল্লাহ একে জীবন দিবেন মৃত্যুর পর? সুতরাং আল্লাহ্ তাকে একশত বছরের জন্য মৃত্যু দিলেন। অতঃপর তাকে জীবিত করলেন।" (সুরা বাকারা - ২৫৯)

এছাড়া ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম-

"হে প্রভু! আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন।" (সুরা মুমিন - ১১)

অতএব মৃত্যুর পর পৃথিবীতে ফিরে আসা ব্যতীত এ আয়াতের কোন অর্থ করা যায় না। যদিও কোন কোন তাফসীরকারক এর অন্য ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন যা কোন বিশ্বস্ত রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি এবং আয়াতের সাথে এর সামঞ্জস্য রক্ষা করে না।

যাহোক দ্বিতীয় সমস্যা যেখানে বলা হয়েছে যে এর স্বপক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলো সঠিক নয় সে সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, রাজআত আহলে বাইত (আঃ) থেকে বর্ণিত বহুলালোচিত মোতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিষয় যার উপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন।

তদুপরি এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আহমাদ আমীনের মত একজন প্রখ্যাত লেখক যিনি বিজ্ঞ বলে দাবী করে থাকেন তিনি ফাজরুল ইসলাম নামক পুস্তকে লিখেছেন-

"রাজআতের কথায় শীয়াদের অবয়বে ইহুদীবাদের প্রকাশ ঘটে।"

আমরা তাকে বলব, তাহলে পবিত্র কোরআনেও ইহুদীবাদ রাজআতের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ পূর্বে যে সকল আয়াত উল্লেখ করেছি তাতে রাজআতের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আমরা তাকে আরো বলব যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনেক বিশ্বাস ও আহকামে ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কারণ, মহানবী (সাঃ) যে ঐশী বিধান এনেছিলেন তা পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী যদিও তার অনেক বিধানকেই পরিত্যাগ করা হয়েছে বা অকার্যকর করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামের বিশ্বাসে ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে তা ইসলামের কোন ঘাটতি বা দোষ নয় যদি ধরেও নেয়া হয় যে, রাজআত হলো ইহুদীবাদের বক্তব্য যা উক্ত লেখক দাবী করেছেন।

যাহোক রাজআত দ্বীনের এমন কোন মৌলিক বিষয় নয় যার উপর বিশ্বাস ও বিবেচনা আবশ্যক, যদিও আমরা এতে বিশ্বাস করি সঙ্গত কারণেই। কারণ, তা আহলে বাইতগণের (আঃ) বর্ণনা থেকে সঠিকভাবে এসেছে। যাদেরকে আমরা মিথ্যাচার থেকে পবিত্র মনে করি। আর তা অদৃশ্যালোকের বিষয় যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তা সংঘটিত হতে কোন বাধা নেই।

৩৩. তাকিয়্যা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

ইমাম সাদিক (আঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"তাকিয়্যা হলো আমার দ্বীন ও আমার পূর্ব পুরুষের দ্বীন এবং যার তাকিয়্যা নেই তার দ্বীনও নেই।"

এটা ছিল আহলে বাইত (আঃ) ও তাঁদের অনুসারীদের জান-মাল হেফাজত করার জন্য তাঁদের শ্লোগান। এ শ্লোগানের মাধ্যমে তাঁরা মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়ন ও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করার এবং আনুগত্যের ছায়াতলে রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

এ তাকিয়্যা আজও শীয়াদের প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়ে আসছে এবং তাদেরকে মুসলমানদের অন্যান্য দল থেকে পৃথক করে। যে কেউ তার বিশ্বাস প্রকাশিত হলে তার জান-মাল বিপদাপন্ন হবে বলে অনুভব করবে তাকে বাধ্য হয়েই গোপনীয়তা ও তাকিয়্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এটা হলো আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির দাবী। এটা সকলেরই জানা আছে ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় শীয়া ও তাদের ইমামগণ (আঃ) সর্বদা নিষ্পেষিত ও স্বাধীনতা বঞ্চিত ছিলেন। কোন গোষ্ঠী ও কোন জাতিই তাদের মত এতটা নিপীড়নের স্বীকার হয়নি। সুতরাং তারা অধিকাংশ সময়ই তাকিয়্যা করতে এবং স্বীয় বিশ্বাসের ও আমলের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে তারা দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আর এ কারণে তাকিয়্যার পরিচিতিতে তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করা হয়।

তাকিয়্যার জন্য আহকাম রয়েছে যা ক্ষতির আশংকা ভেদে নির্দেশ করে কখন তা আবশ্যক এবং কখন অনাবশ্যক। আর এ আহকাম

সন্নিবেশিত আছে ফেকাহর বিভিন্ন পুস্তকে। তাকিয়্যা সর্বদা ওয়াজীব বা আবশ্যক নয়। বরং অবস্থানুসারে কখনো তা আবশ্যক। আবার কখনো বা ইচ্ছাধীন। যদি সত্য প্রকাশ করা দ্বীনের জন্য সহায়ক ও দ্বীনের খেদমত হয় কিংবা দ্বীনের পথে জিহাদ বলে পরিগণিত হয়, তবে জান-মাল সেখানে কোন বিশেষ গুরুত্ব পায় না। আবার যখন তাকিয়্যার কারণে কোন মহাত্মা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মিথ্যা বিস্তৃতি লাভ করে, দ্বীনের মধ্যে ফেসাদ সৃষ্টি হয় কিংবা অজ্ঞতার কারণে দ্বীনের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে অথবা জুলুম ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়, তবে সেখানে তাকিয়্যা করা হারাম। মোটকথা শিয়াদের নিকট এ দৃষ্টিকোণ থেকে নয় যে, তারা এর মাধ্যমে গোপন কোন সংগঠন করে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড চালাবে, যেমনটি তাদের শত্রুরা যারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা বলে থাকে। এ ধরনের লোকেরা আমাদের কথা বুঝার জন্য কোন চেষ্টাই করে না। অনুরূপ তাকিয়্যার অর্থ এই নয় যে, দ্বীন ও দ্বীনের আহকাম তাদের নিকট গোপন ও লুক্কায়িত রাখা, যারা এতে বিশ্বাস করে না। অথচ শিয়াদের ইমামগণ (আঃ) ও লেখকগণ ফিকাহ্, আহকাম, কালামশাস্ত্র ও অন্যান্য বিশ্বাসের উপর বিপুল সংখ্যক বই লিখেছেন যা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাদের দ্বীন ও বিশ্বাসকে বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আমাদের বিশ্বাস তাকিয়্যাকে তারাই বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে চায় যারা শীয়াদেরকে কলংকিত করতে চায়। তারা একে শিয়াদের দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছে। এ কারণেই শিয়াদের কণ্ঠের উপর উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং ওসমানীয়দের মত শত্রুদের উন্মুক্ত তরবারী ঝুলে থাকলেও এবং একজন আহলে বাইতের (আঃ) অনুসারীদের মৃত্যুর জন্য যখন শুধুমাত্র এটুকুই যথেষ্ট যে, 'সে একজন শিয়া' এমন এক পরিস্থিতিতেও তারা তুষ্ট হতে পারেনি।

যদি আমাদের শত্রুরা এ বলে আমাদের অপবাদ দেয় যে, দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকিয়্যার কোন ভিত্তি নেই, তবে আমরা তাদেরকে বলব-

প্রথমত ঃ আমরা আমাদের ইমামগণের (আঃ) অনুগত এবং আমরা তাঁদের পথনির্দেশনায় পথ চলি। তাঁরা (আঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রয়োজনে তাকিয়্যা করতে। তাঁদের কাছে এটা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। বিশেষ করে ইমাম সাদিক (আঃ) থেকে আমরা জানতে পারি-

"যার তাকিয়্যা নেই, তার দ্বীনও নেই।"

দ্বিতীয়ত ঃ তাকিয়্যার বৈধতার ব্যাপারটি পবিত্র কোরআনেও এসেছে। যেমন, সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"সে নয় যে বাধ্য হয় অথচ তাঁর হৃদয়ে রয়েছে দৃঢ় ঈমান।"

এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল আম্মার ইবনে ইয়াসীর সম্পর্কে যিনি কাফেরদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বাহ্যিকভাবে কাফের পরিচয় দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

> **"তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে আল্লাহর কাছে তার জন্য কিছুই নেই। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।"** (সূরা আলে ইমরান - ২৮)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন-

> **"আর একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যে তার ঈমানকে ফেরাউনের লোকদের নিকট গোপন করেছিল।"** (সুরা মুমিন - ২৮)

পর্ব-৪

মহানবীর (সঃ) আহলে বাইত থেকে শিয়াদের জন্য শিক্ষা

ভূমিকা

আহলে বাইতের পবিত্র ইমামগণ (আঃ) জানতেন যে তাঁদের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁদের হাতে ফিরে আসবে না। ফলে তাঁদেরকে (আঃ) এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে অন্যের শাসনাধীন থাকতে হবে। সুতরাং এমন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে শক্তি ও প্রচন্ডতা নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে।

সুতরাং এটা স্বাভাবিক (এক দৃষ্টিকোণ থেকে) তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের দ্বীন ও অনুসৃত পন্থাকে গোপন করতে হবে। তাকিয়্যার ধারাবাহিকতায় তাঁরা নিজেদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অন্যের ক্ষতি বা দ্বীনের ক্ষতির জন্য নয় বরং তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল ফেতনা, শঠতা ও শত্রুতার উত্তাল সমুদ্রে টিকে থাকা।

তাঁদের ইমামতের দাবী মোতাবেক (অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে) আবশ্যক হলো তাঁদের অনুসারীদের ইসলামী শরীয়তের বিধান বিশেষ পন্থায় শিক্ষা দেয়ার পিছনে সময় দেয়া। সেই সাথে কল্যাণকর ও সঠিক সামাজিক নীতি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া, যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ ও প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হতে পারে।

আহলে বাইতের (আঃ) শিক্ষাপদ্ধতি এ পুস্তিকার ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁদের শিক্ষার উদাহরণস্বরূপ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে আমরা আকায়েদের উপর ইমামদের (আঃ) শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করলে মন্দ হয় না যা ইমামগণ (আঃ) তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য এবং মানুষের অন্তর থেকে পাপ-পংকিলতা দূর করে সত্যবাদী-ন্যায়পরায়ণ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা যে তাকিয়্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তা-ও এ কল্যাণময় শিক্ষারই অন্তর্ভূক্ত। আমরা নিম্নে আরো কিছু শিষ্টাচারমূলক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩৪. দোয়া সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

মহানবী (সাঃ) বলেনঃ

"দোয়া হলো বিশ্বাসীদের অস্ত্র, দ্বীনের খুঁটি এবং আকাশ ও পৃথিবীর জন্য নুর।"

আর এটি শিয়াদের বিশেষত্বে পরিণত হয়েছে যার দ্বারা এ গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্রভাবে সনাক্ত করা যায়। তারা এ দোয়ার গুরুত্ব, আদব এবং এগুলোর মধ্যে কোনগুলো আহলে বাইত (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে শত শত পুস্তক ও পুস্তিকা লিখেছেন। এ সকল পুস্তক-পুস্তিকায় মহানবীর (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের (আঃ) লক্ষ্য সম্পর্কে এসেছে। আর সেই সাথে তাঁদের অনুসারীদেরকে দোয়া পাঠের ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেয়া হয়েছে। এমনকি তাদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

"সর্বোত্তম প্রার্থনা হলো দোয়া।"

"মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো দোয়া।"

"নিশ্চয়ই দোয়ার মাধ্যমে চরম দূর্দশা ও শাস্তি অপসারিত হয়।"

"দোয়া সকল শারীরিক ও মানসিক পীড়া থেকে মানুষকে মুক্তি দান করে।"

দোয়ার সম্রাট হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আঃ) থেকে অসংখ্য দোয়া বর্নিত হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট, তিনি হলেন একত্ববাদীদের সর্দার এবং বিশ্বাসীদের শিরোমণি। তাঁর বক্তৃতার মত তাঁর দোয়াও আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। যেমন- দোয়ায়ে কুমাইল ইবনে যিয়াদ নামে প্রশিদ্ধ দোয়াটি। এ দোয়াগুলোতে সন্নিবেশিত আছে খোদা পরিচিতি, দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা একজন সঠিক ও সমুন্নত মুসলমান হওয়ার পথে সহায়ক।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের (আঃ) নিকট থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো মুসলমানদের জন্য উত্তম পন্থাস্বরূপ। যদি কেউ

এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে এগুলো তাকে ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদান করবে এবং আল্লাহর পথে পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী করবে। আর সেই সাথে তাকে এবাদতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দিবে, এবাদতের মাধুর্য আস্বাদন করাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুকেই সে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং তাঁর প্রতিই কেবল মনোনিবেশ করাবে। দ্বীনের যা কিছু শেখা মানুষের জন্য আবশ্যক সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে। এভাবে তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। আর সেই সাথে অনাচার, কুমন্ত্রণা ও বাতিল থেকে দূরে রাখবে। মোট কথা, একদিকে এ দোয়াগুলোতে নৈতিকতা, আদর্শ ও আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং ইসলামী আকীদার দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে গভীর জ্ঞান। অন্যদিকে এমনকি এ দোয়াগুলো খোদাতত্ত্ব ও নৈতিকতার সম্পর্কে দার্শনিক ও অন্যান্য জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এ সকল দোয়ার অন্তর্নিহিত সমুন্নত তাৎপর্যে যে হেদায়াত বা পথ নির্দেশনা বিদ্যমান তা অনুসরণ করতে যদি মানুষ সচেষ্ট হত (দুঃখের বিষয় তারা সচেষ্ট নয়) তবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা অনাচারের নামমাত্রও শ্রুত হত না। কিংবা যে আত্মাগুলো পাপাচারে সিক্ত হয়ে নরকাগ্নিতে পতিত হয়েছে, তারা সত্যের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে মুক্ত জীবন লাভ করত। কিন্তু এ ধরনের কোন সংস্কারক যিনি মানবতাকে সত্যের প্রতি আহবান করেন তার কথায় কর্ণপাত করা প্রায়ই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। সুতরাং মহান আল্লাহ মানব প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন-

> **"নিশ্চয়ই নফসে আম্মারা (মন্দকর্মপ্রবণ মন) মানুষকে অসৎকাজের প্রতি আহবান করে।"** (সুরা ইউসূফ - ৫৩)

> **"অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করবে না যদিও তোমার আন্তরিক কামনা তাই।"** (সুরা ইউসূফ - ১০৩)

অসৎকর্মের উৎস হলো মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা, স্বীয় ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা যার ফলে স্বীয় অসৎকর্মকে সুকর্ম ভেবে মিথ্যা তুষ্টি লাভ করে। সুতরাং সে অন্যের উপর অত্যাচার করে, অন্যের সম্পত্তি দখল করে, মিথ্যাচার করে, তোষামোদ করে, স্বীয় কামনার বশবর্তী হয় ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অথচ নিজেকে প্রবঞ্চিত করে এভাবে যে, সে বস্তুতঃ তার কামনার বশবর্তী নয়। বরং এগুলো করার প্রয়োজন ছিল কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে স্বীয় চক্ষুকে তার কুৎসিত কর্ম থেকে ঢেকে রাখে। আর

এভাবে সে স্বীয় ভুল-ভ্রান্তিকে ছোট করে দেখে। নিম্নের বর্ণিত মর্মস্পর্শী দোয়াগুলো ইলহামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত। এ দোয়াগুলো মানুষকে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহকে ডাকতে ও তাঁর নৈকট্য লাভের পথে প্রভাবিত করে। অনুরূপ স্বীয় পাপ কর্মের স্বীকারোক্তি করতে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নিজেকে নিমগ্ন রাখতে এবং স্বীয় অহমিকা ও দম্ভকে অবদমন করতে সহায়তা করে। যেমন- দোয়াকারী 'দোয়ায়ে কুমাইল ইবনে যিয়াদ' পাঠ করার সময় বলে ঃ

> **"হে আমার প্রভু, হে আমার মালিক, তুমি আদেশ দিয়েছ কিন্তু আমি আমার কামনার বশবর্তী হয়েছি। আমি শত্রুর পাতা ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি যে পাপকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে এবং মানুষকে ঐ গুলোতে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। আমার শত্রু আমার সাথে প্রতারণা করেছে এবং আমার হতভাগ্য তাকে সাহায্য করেছে যার জন্য আমি সীমা লংঘন করেছি এবং তোমার কিছু কিছু আদেশ অমান্য করেছি।"**

নিঃসন্দেহে গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে স্বীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি ধীরে ধীরে তাকে জন সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করা তার জন্য সহজ করে যদিও এ ধরনের স্বীকারোক্তি তার উপর হৃদয় বিদারক প্রভাব ফেলে। এ ধরনের অনুশোচনা মানুষের অন্তরের কলুষতা হ্রাসে এবং কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে মহান ভূমিকা পালন করে। যদি কেউ স্বীয় আত্মশুদ্ধি কামনা করে তবে তাকে এ ধরনের একাগ্রতা ও নির্জনতা সৃষ্টি করে মুক্তভাবে স্বীয় কৃতকর্মের পর্যালোচনা করতে হবে। আর এ একাগ্রতা, আত্মসমালোচনার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো এ মর্মস্পর্শী দোয়াগুলো পাঠ করা যেগুলোর গুরুগম্ভীর ভাব গভীর ভাবে অন্তরাত্মাকে নাড়া দেয়। যেমন- আমরা দোয়ায়ে আবি হামজা সুমালীতে (রেজওয়ানুল্লাহ তায়ালা আলাইহি) পড়ে থাকি যে দোয়া ইমাম যয়নুল আবেদীন (আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

> **"প্রভু হে! আমার সমস্ত দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখে আমাকে মহান কর এবং তোমার দয়া দ্বারা আমাকে ক্ষমা করে দাও।"**

আমাকে মহান কর কথাটির উপর চিন্তা করলে আমরা জানতে পারি যে স্বীয় দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে মানুষের বিশেষ আগ্রহ আছে। এ কথাটি আমাদেরকে অবহিত করে যে, মানুষ স্বয়ং কুৎসিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হয়ে পরবর্তীতে দোয়ায় বলে-

"যদি আমি জানতাম অদ্য তুমি ভিন্ন অন্য কেউ আমার গুনাহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে তবে আমি তা করতাম না। আর আমি যদি জানতাম যে খুব শ্রীঘ্রই আমি আমার পাপের জন্য শাস্তি পাব, তবে নিজেকে ঐগুলো থেকে দূরে রাখতাম।"

এ ধরনের স্বীকারোক্তি করার মত মন মানসিকতা এবং স্বীয় পংকিলতাকে ঢেকে রাখার উৎকণ্ঠা মানুষকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে যাতে মানুষের সম্মুখে স্বীয় পাপাচারের জন্যে মহান আল্লাহ তাকে ইহ এবং পরকালে অপমানিত না করেন।

এমতাবস্থায় নির্জনে মিনতি প্রকাশকালে মানুষ এক বিশেষ পুলক অনুভব করে, আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্তে মগ্নতা আসে। তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জন সম্মুখে অপমানিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার পাশাপাশি মহান আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। এরপর ইমাম (আঃ) এ দোয়ায় আরও বলেন-

"হে আল্লাহ! (আমার গুনাহের ব্যাপারে) তোমার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তোমার ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করি এবং প্রশংসা করি তোমার ক্ষমার যদিও তুমি (শাস্তি প্রদানে সক্ষম ও) মহাপরাক্রমশালী।"

অতঃপর এ দোয়ায় মানব প্রবৃত্তিকে অপরাধের পর এভাবে ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সে মহান আল্লাহর ধৈর্যশীলতা ও বদান্যতার কারণে এ অপরাধ করেছে, আল্লাহকে অস্বীকার বা তাঁর নির্দেশকে তুচ্ছ করার উদ্দেশ্যে নয় যাতে করে প্রভু ও দাসের মধ্যকার সম্পর্কে কোন ফাটল না ধরে । তাই বলা হচ্ছেঃ

"প্রভু হে! আমার প্রতি তোমার সহনশীলতা আমাকে পাপের পথে পরিচালিত হতে সাহসী করেছে এবং তা করতে আমাকে প্রবৃত্ত করেছে। আর আমার গুনাহের উপর তোমার আচ্ছাদন আমাকে নির্লজ্জতার দিকে আহবান করেছে। তোমার অপরিসীম ক্ষমা ও রহমত সম্পর্কে আমার জ্ঞান আমাকে তোমার নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি ধাবিত করেছে।"

এ ধরনের অনেক মোনাজাত বর্ণিত হয়েছে যেগুলো মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে, আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকতে মানুষকে সাহায্য করে। আর আমাদের এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এর বেশী বর্ণনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিছু কিছু দোয়ার বিষয়বস্তু খুবই বিস্ময়কর। খোদার নিকট ক্ষমা ও মাগফেরাত কামনার সাথে সাথে যে যুক্তিগুলো

উপস্থাপন করা হয়েছে তা কতইনা বিস্ময়কর। যেমন- দোয়ায়ে কুমাইলে আমরা দেখতে পাই-

> **"হে আমার প্রভু! যদি জানতে পারতাম! তোমার আগুন কি সে সকল মুখমন্ডলকে আবেষ্টিত করবে যেগুলো তোমার মহিমায় সিজদাবনত হত! সেই জিহ্বাগুলোকে কি আগুনে নিক্ষেপ করবে যেগুলো সত্য বিশ্বাস সহকারে একত্ববাদের ঘোষণা দিত এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার প্রশংসা করত! যেসকল হৃদয় তোমার প্রভুত্বে সত্যিকারার্থে বিশ্বাসী ছিল? তুমি কি সেসকল অন্তরাত্মাকে নরকাগ্নিতে ভস্মীভূত করবে তোমার মহত্বের জ্ঞান যাদেরকে বিনয়ী করেছিল অথবা সেসকল অঙ্গপ্রতঙ্গকে যেগুলো তোমার এবাদতের জন্য আগ্রহ সহকারে এবাদত স্থানগুলোর দিকে ধাবিত হত ও আত্মসমর্পিত হয়ে তোমার ক্ষমা কামনা করত? না, এমনটি তোমার সম্পর্কে কেউই ধারণা করতে পারেনা। আমাদের কাছে তোমার নিকট হতে কল্যাণ ব্যতীত কোন সংবাদ নেই।"**

আমরা যদি সুস্পষ্টভাবে এর সুগভীর অর্থ ও সুনিপুণ বর্ণনার দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে, স্বীয় দোষ-ত্রুটি এবং খোদার দাসত্ব স্বীকার করার পাশাপাশি এ দোয়াটি আমাদেরকে শেখায় খোদার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হতে।

যেহেতু এ দোয়াগুলো স্বীয় বিবেক হতে উৎসারিত সেহেতু সমস্ত ওয়াজীবগুলো সম্পাদিত হয়। কারণ উপরোক্ত দোয়ায় আমরা দেখতে পেয়েছি, ধরে নেয়া হয়েছে যে, সে সমস্ত ওয়াজীবগুলোকে পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছে। সুতরাং সে খোদার দয়া ও করুণা পাবার যোগ্য। দোয়ার এ শিক্ষাই মানুষকে স্বীয় অন্তরাত্মার প্রতি ফিরে তাকাতে উৎসাহ প্রদান করে যাতে ওয়াজীব কর্মগুলো ইতিপূর্বে সম্পাদন না করলেও এখন সম্পাদন করে নেয়। আর তখন মহান আল্লাহর দরবারে তার উপস্থাপিত যুক্তি সত্য ও সঠিক হবে।

উপরোল্লিখিত এ যুক্তির পর পরই দোয়ায়ে কুমাইলে আমরা দেখি-

> **"হে মা'বুদ, হে আমার মালিক! হে আমার প্রভু! মেনে নিলাম যে তোমার শাস্তির মাঝে আমি ধৈর্য ধারণ করব, কিন্তু কি করে তোমার বিরহ সহ্য করব? (কারণ আযাবের সময় মানুষ মহান আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে থাকে) হে আমার আল্লাহ, ধরে নিলাম যে অগ্নিদাহে তোমার শাস্তি আমি সহ্য করতে পারব কিন্তু তোমার করুণার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়া কি করে সহ্য করব?"**

হ্যাঁ এগুলো হলো সেই কথাসমষ্টি যা মহান আল্লাহর নৈকট্যের স্বাদ আস্বাদনের আবশ্যকতা সম্পর্কে মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়। অনুরূপ আল্লাহর করুণা, পরাক্রম ও বন্ধুত্বকে অনুধাবনের স্বাদ সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকে এ দোয়াগুলো। আর তাকে বুঝায় যে, এ আকর্ষণ ও নৈকট্য এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে, এর অন্যথা হলে তা তার কাছে নরকাগ্নির তাপদাহ অপেক্ষা শাস্তি দায়ক মনে হয়। ফলে মানুষ অগ্নিদাহ সহ্য করতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও নৈকট্যের আকর্ষণকে ত্যাগ করতে পারে না। এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আরও শিখায় যে, মহান আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব এবং প্রিয়তম প্রভুর নৈকট্যের স্বাদ আস্বাদনই আমাদের পাপ মোচনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম শাফাআতকারী যার ফলে মহান আল্লাহ আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। প্রজ্ঞাময়, তওবা গ্রহনকারী, পাপ ক্ষমাকারী মহান আল্লাহর প্রতি প্রেমের সৌন্দর্য ও তাঁর দয়ার কথা কারো অজানা নয়।

এখানে 'মাকারেমূল আখলাক' থেকে কিছুটা আলোকপাত করতে আমাদের কোন বাধা নেই। কারণ, উক্ত দোয়ায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য গুলো বিশ্বমানবতার প্রত্যেক সদস্য এবং দলেরই থাকা আবশ্যক। দোয়াটির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ-

> **"প্রভু হে! আমাদেরকে তোমার আনুগত্যের ও পাপ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান কর। আমাদেরকে সত্য নিয়্যত ও তোমার নিষেধের সীমাকে জানার যোগ্যতা দান কর। আমাদেরকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত কর। সত্যপথে দৃঢ় রাখ, সত্য বলা ও হিকমাত বলার জন্য আমাদের জিহ্বাকে প্রস্তুত করে দাও। আমাদের অন্তর গুলোকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ণ করে দাও। আমাদের উদরগুলোকে নিষিদ্ধ বস্তু ও সন্দেহজনক বস্তু থেকে পবিত্র করে দাও। আমাদের হস্তগুলোকে জুলুম, অত্যাচার ও চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত রাখ। অশ্লীলতা ও খিয়ানত থেকে আমাদের চক্ষুগুলোকে আবৃত কর এবং আমাদের কর্ণগুলোকে অনর্থক কথাবার্তা ও পরনিন্দা (গিবত) শ্রবণ থেকে দূরে রাখ। আমাদের আলেমগণকে সংযম ও নসিহত দান কর। আমাদের বিদ্যানুসন্ধানীদের জ্ঞানার্জনের প্রতি আকর্ষণ দান কর ও পরিশ্রমী কর। আমাদের শ্রোতাদেরকে নসিহত গ্রহণ করার মত শ্রবণ শক্তি দান কর। মুসলমানদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা ও স্বস্তি দান কর। আমাদের মৃতজনকে দয়া ও করুণা কর। আমাদের অনুসারীদেরকে সম্মান ও মহত্ত দান কর। আমাদের যুবকদেরকে প্রকৃত ঈমান দান কর**

এবং অনুশোচনা দাও। আমাদের মহিলাদেরকে লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতা দান কর। ধনী ও সম্পদশালীদেরকে বিনয় ও উদার হৃদয় দান কর। আমাদের দরিদ্রজনকে ধৈর্য্য ও তুষ্টি প্রদান কর। আমাদের সৈন্যদেরকে সহযোগিতা ও বিজয় দান কর। আমাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি ও সস্তি দান কর। আমাদের শাসকদেরকে ন্যায়পরায়ণতা দান কর ও জনগণের প্রতি বন্ধুপরায়ণ কর। আমাদের নাগরিকদেরকে ইনসাফ ও সুন্দর চরিত্র দান কর। আমাদের হাজী ও যিয়ারতকারীদেরকে উপায় ও উপকরণ দ্বারা ধন্য কর। আর তাদের উপর যে হজ্জ ও উমরাহ্ আবশ্যক করেছ তা সম্পাদন করিয়ে দাও। দয়া ও করুণার দ্বারা আমাদের এ দোয়াগুলোকে কবুল কর, হে দয়াশীলদের শ্রেষ্ঠ।"

আমি পাঠক ভাইদেরকে এ দোয়াটি সর্বদা পাঠ করার জন্যে পরামর্শ দিব। আর সেই সাথে বলব তারা যেন এর ভিত্তি ও উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মনোযোগী ও একাগ্রচিত্তে এ দোয়াটি পাঠ করেন। অর্থাৎ ঐগুলোকে আন্তরিকতার সাথে এমনভাবে পাঠ করেন যেন তারা স্বয়ং এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এ ক্ষেত্রে আহলে বাইত (আঃ) থেকে আপনাদের জন্য যে আদব পদ্ধতি বর্ণিত করেছে তা অনুসরণীয়। কারণ এ দোয়াগুলো মনোযোগ ও আন্তরিকতা ব্যতীত অসার জিহ্বা সঞ্চালন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা মানুষের জন্য কখনোই খোদা পরিচিতি, জ্ঞান, নৈকট্য, মুক্তি ও সফলতা বয়ে আনে না। কিংবা মানুষের কোন কষ্ট-ক্লেশই লাঘব করে না এবং তার দোয়াও কবুল হয় না। কারণ, যে দোয়া ভাবাবেগ ও মনোযোগের সাথে পড়া হয় না মহান আল্লাহ্ তা গ্রহণ করেন না। কিন্তু যখন কোন দোয়া মনোযোগ, আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সাথে পড়া হয় নিশ্চিতরূপে তা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

৩৫. সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার দোয়াসমূহের মূল বিষয়বস্তু ঃ

কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর বনি উমাইয়্যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে পরিপূর্ণরূপে কুক্ষিগত করেছিল। ফলে তাদের স্বৈরাচারী কর্মকান্ড আরও ব্যাপকমাত্রায় বৃদ্ধি পেল। ব্যাপক রক্তপাত করা ছাড়াও তারা ধর্মীয় শিক্ষাকে তিরস্কার করল। ফলে সিজদাকারীদের সরদার ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) স্বীয় গৃহে ব্যথাতুর ও শোকাতুর হৃদয়ে দিন যাপন করতে লাগলেন। ইমামের (আঃ) গৃহে শত্রুদের ভয়ে কেউ নিকটবর্তী পর্যন্ত হতে পারত না। এমনটি শত্রুদের কঠোর নজরদারীর কারণে ইমামও যথার্থরূপে

মানুষের জন্যে কল্যাণকর্ম সম্পাদন করতে পারতেন না এবং ইসলামের প্রকৃত আহকাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতে পারতেন না।

অতএব, কোন উপায় না পেয়ে তিনি দোয়ার মাধ্যমে মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। দোয়ার সেই পদ্ধতি যা প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রসূ -ইতিপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি- কোরআনের শিক্ষা, ইসলামী আদব ও আহলে বাইতের (আঃ) পথের প্রসারে সর্বোত্তম পন্থা এবং ধর্মীয় মনমানসিকতা, সংযম ও খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর বলে পরিচিত। এগুলোর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষের উপায়সমূহ মানুষকে শিক্ষা দেয়া যায়। দোয়ার এ পদ্ধতি ছিল চতুর্থ ইমামের (আঃ) এক বিশেষ ও অভিনব পন্থা যে, এ ক্ষেত্রে নিন্দুকদের কোন প্রকার অপপ্রচারের সুযোগ ছিল না। এটি এমন এক পদ্ধতি যাকে তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেনি। আর এ কারণেই অতিউচ্চ সাহিত্যমান ও সমুন্নত বাগ্মীতাপূর্ণ বাক্য সংশ্লিষ্ট ইমামের (আঃ) অনেক দোয়া আছে। এগুলোর কিছু কিছু সহীফায়ে সাজ্জাদিয়া নামক পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে যাকে ইসলামের ইতিহাসে মোহাম্মদের (সাঃ) বংশধরদের 'যবুর' বলে নামকরণ করা হয়। ঐ দোয়াগুলোর প্রকাশ পদ্ধতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আরবী ভাষার সর্বোচ্চ পদ্ধতির সমাহার ঘটেছে। সত্য ধর্ম ইসলামের নিয়ম, তাওহীদ ও নবুওয়াতের সূক্ষ্ম রহস্য, মোহাম্মাদী শিষ্টাচারের সঠিকতম পদ্ধতি ও ইসলামী আদব সমুন্নত স্তরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বীনী প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এগুলোতে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং ঐ দোয়াগুলো প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ও আখলাক সম্পর্কিত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যা দোয়ার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে কিংবা এমন দোয়া যা দ্বীনী ও আখলাকের শিক্ষারূপে প্রকাশ লাভ করেছে।

হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীনের (আঃ) দোয়াগুলো নিশ্চিতরূপে কোরআন ও নাহ্‌জুল বালাগার পর আরবী ভাষার সর্বোত্তম বাচনভঙ্গি এবং ইলাহিয়্যাত (স্রষ্টাতত্ত্ব) ও আখলাকের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দার্শনিক পন্থা বলে পরিগণিত হয়। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি শিখায় কিরূপে মহান আল্লাহকে তাঁর মহিমা সহকারে স্মরণ করতে হবে, কিরূপে তাঁর পবিত্র সত্তার পবিত্রতা জ্ঞাপন করতে হবে, কিরূপে তাঁর প্রশংসা ও তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং কিরূপে স্বীয় গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কিছু কিছু দোয়া আছে যেগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় কিরূপে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট মিনতি করতে হবে। কোন কোন দোয়ায় আবার

আল্লাহর নবীর (সাঃ) উপর দুরূদ পাঠের অর্থ আখলাকের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তদ্রূপ তা সম্পাদন করার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। এ দোয়াগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আমাদেরকে শিখায় কিরূপে মোনাজাত করতে হবে, কিরূপে একাগ্রে নির্জনে খোদাকে ডাকতে হবে। কোন কোনটি আবার শিখায় কিরূপে পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করতে হবে। কোন কোনটি আমাদেরকে জানায় সন্তানের প্রতি পিতার কী অধিকার কিংবা পিতার প্রতি সন্তানের কী অধিকার অথবা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনের কী অধিকার। এ দোয়াগুলোতে আমরা আরও পাই সমস্ত মুসলমানের অধিকার, ধনীদের নিকট দরিদ্রজনের অধিকার কিংবা দরিদ্রের নিকট ধনীদের অধিকার সম্পর্কে জানতে।

অপর কিছু দোয়া আছে যা আমাদেরকে লেনদেনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জীবনে যে সমস্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করে চলতে হবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান দান করে। আমাদেরকে শিখায় কিরূপে নিকটজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি সকল মানুষের সাথে আচরণ করতে হবে।

এ দোয়াগুলোর মধ্যে সমস্ত সুন্দর আখলাকের (যা সকল মানুষেরই থাকা উচিৎ) সমাহার ঘটেছে। এমনকি তা আখলাক শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বিধান হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ দোয়াগুলোর কোন কোনটি আমাদেরকে শিখায় কিরূপে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা, সংকট, দুঃর্ঘটনায় স্থির ও অবিচল থাকা যায় কিংবা সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় কিরূপ আচরণ করতে হয়।

এ দোয়াগুলোর কোন কোনটি ইসলামী সৈন্য ও সেনাবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে। তদ্রূপ কোন কোনটিতে সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, যা কিছু মোহাম্মদী আখলাক ও ঐশী শরীয়তের দাবী তাই কেবলমাত্র দোয়ার আকৃতি ও পোশাকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এর দোয়াগুলোর দৃষ্টান্ত নিম্নরূপে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

প্রথমত ঃ মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ পরিচিতি, তাঁর মাহাত্ম ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান, তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা এবং সকল প্রকার ঘাটতি থেকে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও পারিভাষিক বর্ণনা এসেছে। এ বিষয়গুলো গভীর ও বৈচিত্রময় বর্ণনায় এ দোয়াগুলোতে স্থান পেয়েছে। যেমন- আমরা সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার প্রথম দোয়ায় পড়ি-

"প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রারম্ভে যাঁর পূর্বে কোন শুরু নেই এবং তিনি সবকিছুর শেষে যাঁর শেষে কোন শেষ নেই। (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তারই প্রাপ্য); যাঁর সত্তাকে কোন দৃষ্টিবানের চক্ষুই দেখতে সক্ষম নয়। সমস্ত প্রশংসাকারীর ধারণা তাঁর পূর্ণতাগুণের বর্ণনা দিতে অক্ষম ও অপারগ (কারণ, সৃষ্টিকুলের কোন সৃষ্টির চিন্তাই তাঁর সত্তার পরিচিতি লাভ করতে পারে না) তিনি হলেন সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পূর্ববর্তী নজির ছাড়াই অস্তিত্বে এনেছেন এবং স্বীয় ইচ্ছা ও প্রত্যয়ে যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন।"

প্রথম ও শেষ শব্দগুলোর অর্থের দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিলে আমরা জানতে পারব যে কিরূপে মহান আল্লাহকে এগুলো থেকে পবিত্র মনে করা যায়। যেমন- চর্মচক্ষুতে দর্শন, মস্তিষ্কে ধারণা ধারণ করা। পুনরায় সৃষ্টি ও অস্তিত্ব জগতের অর্থের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, কিরূপে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ঐ গুলোকে অস্তিত্বে এনেছে।

সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার ষষ্ঠ দোয়ায় অন্য এক পদ্ধতিতে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে-

"প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই যিনি দিবা-রাত্রকে সৃষ্টি করেছেন ও তাদেরকে স্বীয় ক্ষমতাবলে পরস্পর থেকে পৃথক করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে একে অপরের মাঝে প্রবেশ ঘটান এবং এর মাধ্যমে বান্দাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা ও তাদের বিকাশ ঘটান। তিনি রাত্রিকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, এর আগমনে সকল কর্ম ও প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে তারা বিশ্রামে মশগুল হবে। তিনিই রাত্রিকে তাঁর বান্দাদের নিদ্রা ও বিশ্রামের পোশাকরূপে নির্ধারণ করেছেন যাতে এ আরাম ও নিদ্রার ফলে তাদের দেহে শক্তি সঞ্চয় হয় ও তারা জীবনের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ পায়।"

এ দোয়ায় কিরূপে দিবা-রাত্রির সৃষ্টিকে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, আর সেই সাথে এ সমুদয় নেয়ামতের জন্য মানুষকে যে শুকুর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। পুনরায় অন্যভাবে আমরা সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার সপ্তম দোয়ায় পাঠ করি যে, সমস্ত কিছুর ক্ষমতা মহান আল্লাহরই হাতে-

"হে তিনি! যাঁর হাতে সমস্ত সমস্যার সমাধান, হে যাঁর মাধ্যমে কষ্ট দূর হয়, হে যাঁর কাছে আত্মিক মুক্তি ও প্রশস্ততা কামনা করা হয়, একমাত্র তোমার পরাক্রমেই সমস্যার সমাধান হয়। আর তোমার দয়ায়ই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছার কারণসমূহ সৃষ্টি হয়। তোমার ক্ষমতাই (সমস্ত বস্তু ও অস্তিত্বশীলের উপর) চূড়ান্তভাবে কার্যকর রয়েছে। সমস্ত কিছু কেবলমাত্র তোমার ইচ্ছায় কোনপ্রকার বাক্য ব্যয় ব্যতিরেকেই অস্তিত্বে আসে। অনুরূপ কোন নিষেধাত্মক বাক্যব্যয় ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র তোমার ইচ্ছায়ই বস্তুসমূহ বিলীন হয়।"

দ্বিতীয়ত ঃ সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার দোয়াগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দোয়া আছে সেগুলোতে বান্দাদের উপর মহান আল্লাহর ফযল ও রহমতের কথা এবং উক্ত ফযল ও রহমতের হক আদায় করতে তাদের অপারগতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমন একটি দোয়ায় মহান আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত এবং মহান আল্লাহর জন্য অন্য সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে। যেমন- আমরা ৩৭নং দোয়ায় পাঠ করি-

"কেউই পূর্ণরূপে তোমার শোকর ও প্রশংসা করতে পারে না, যদি না তোমার দয়া ও করুণায় সে সকল বিষয়গুলো অর্জন করে যেগুলো অর্জন করা তোমার শোকরের জন্য আবশ্যক। কেউ শত চেষ্টা করলেও তোমার আনুগত্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে পারে না যদি না কেবল একথা স্বীকার করে যে, তোমার অধিকারানুযায়ী এবাদত করতে অপারগ। সুতরাং সর্বাধিক কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও তোমার প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম এবং সর্বাধিক এবাদতকারীও তোমার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে অক্ষম।"

মহান আল্লাহর নেয়ামতের মাহাত্ম ও অসীমত্বের কারণে তাঁর পূর্ণ শোকর করতে অপারগ। সুতরাং তার কী অবস্থা যেখানে বান্দা তাঁর শুকর করে শেষ করতে পারে না, সেখানে সে সীমালংঘন করে ও পাপকর্মে লিপ্ত হয়। কারণ এমন এক পাপকর্মের পর যা-ই করুক না কেন ঐ পাপকর্মকে ধ্বংস করা যায় না। (কারণ এর প্রভাব নষ্ট করার জন্য যে কোন ভাল কর্মই খোদার দয়ায় করবে, তার জন্য শোকর এবং কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে হবে)। এটি হলো তাই যা আমরা পরবর্তীতে ১৬তম দোয়ায় পাঠ করি-

"হে আমার প্রভু! যদি আমি তোমার নিকট এমনভাবে ক্রন্দন করি যে আমার চোখের পত্রগুলো ঝরে যায়; যদি এমন সুউচ্চ স্বরে বিলাপ করি যার ফলে আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়; যদি তোমার নিকট মোনাজাত ও

> তোমার এবাদতে এমনভাবে দাঁড়াই যে আমার পদযুগল অবশ হয়ে আসে; যদি তোমার জন্য এমনভাবে রুকু করি যে আমার মেরুদন্ড স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এমনভাবে সেজদা করি যে, আমার চক্ষুগুলো অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসে; কিংবা আমার সমস্ত জীবনে খাদ্যের পরিবর্তে মাটি খাই, পরিষ্কার পানির পরিবর্তে ঘোলা পানি পান করি; আর এগুলোর মোকাবিলায় যদি তোমার যিকির এমনভাবে করি যার ফলে আমার জিহ্বায় জড়তা এসে যায়; তবুও লজ্জার কারণে চক্ষু তুলে আকাশের পানে চাইতে পারব না যে ঐ কর্মগুলো আমার কোন একটি গুনাহ্ মোচনের কারণ হবে।"

তৃতীয়ত ঃ কিছু কিছু দোয়ায় সওয়াব, শাস্তি, বেহেশত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- সওয়াব হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও দয়া। মানুষ মাত্রই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির যোগ্য হয়। কারণ তিনি গুনাহ্ সম্পর্কে মানুষের নিকট চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপন করেছেন। হযরত ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এর সমস্ত দোয়াই এর সুন্দর সুর মাধুর্যে অন্তরাত্মার উপর প্রভাব ফেলে এবং তাকে মহান আল্লাহর শাস্তির ভয় ও সওয়াবের আশা করতে প্রশিক্ষণ দেয়। এ দোয়াগুলোর সবই ভয় ও আশার কথা বলে অপূর্ব পদ্ধতিতে ও বৈচিত্র্যময় বাচন ভঙ্গিতে। ফলে এ কথাগুলো কোন ব্যক্তির হৃদয়ে পাপের পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞান, চিন্তা, ভয়-ভীতি জাগিয়ে তোলে। যেমনটি আমরা ৪৬তম দোয়ায় পাঠ করি-

> "তোমার পক্ষ থেকে সকলের জন্য চূড়ান্তরূপে দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। তোমার ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত, কখনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। অতএব, চিরদুর্ভোগ তার যে তোমা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অপমানকর নৈরাশ্য তার জন্য যে তোমার থেকে নিরাশ হয়। সর্বাধিক হতভাগ্য সে যে তোমাকে প্রবঞ্চনার চেষ্টা করে। তার উপর তোমার আজাব কঠোর। সে কতই না তোমার আজাব ও শাস্তিতে থাকবে! ঐ ব্যক্তির লক্ষ্যস্থল মুক্তির পথ থেকে কত দুরে, সে সহজ পরিত্রাণ হতে কতইনা নিরাশ। তুমি বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার কারণে তাতে অন্যায় কর না। চূড়ান্ত ফয়সালার ক্ষেত্রে তুমি ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী।"

তেমনি ৩১তম দোয়ায় আমরা পড়ি-

> "হে আল্লাহ্ আমাকে রহম কর তোমার সামনে আমার একাকিত্বের মূহুর্তে, করুণা কর তোমার ভয়ে কম্পমান আমার হৃদয়কে ও তোমার

মহিমায় আলোড়িত আমার অঙ্গপ্রতঙ্গকে, হে প্রভু আমার পাপরাশি আমাকে অপমানের স্থানে বসিয়েছে ও তোমার ধ্বংসের উপযুক্ত করে দিয়েছে (ক্রোধে নিপতিত করেছে), যদি তুমি আমাকে নিরব কর তারপর কেউই আমাকে নিয়ে কথা বলবে না, আর যদি আমাকে ক্ষমা কর আমি তো তার উপযুক্ত নই।"

তেমনি ৩৯তম দোয়ায় আমরা পড়ি-

"যদি আমাকে সত্যের মানদন্ডে পরিমাপ কর তবে আমাকে ধ্বংস করলে, যদি আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত না কর তবে আমার বিনাশ সাধন করলে, ... আমার সে পাপের বোঝা অপসারণ কর যা আমাকে কষ্টে ফেলেছে, সেই বোঝা হতে মুক্তি পেতে তোমার সাহায্য চাই যার ভার আমাকে নুজ করে দিয়েছে। অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের উপর দরূদ বর্ষণ কর এবং যে জুলুমসমূহ নিজের উপর করেছি তা ক্ষমা করে দাও। আর স্বীয় রহমতকে পাপের যে বোঝা আমার উপর চেপে বসেছে তা বহনের দায়িত্ব দাও।"

চতুর্থত ঃ দোয়া পাঠকারী এ ধরনের দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে নিজেকে অশ্লীল, অপছন্দনীয় কাজগুলো থেকে এবং ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে রাখতে পারে ফলে নিজ অভ্যন্তরকে ও কালবকে পরিষ্কার ও পবিত্র রাখতে পারে। যেমন- সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার বিশতম দোয়ায় আমরা পাঠ করি-

"প্রভু হে! আমার কল্যাণমূলক নিয়্যতকে বাড়িয়ে দাও। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ কর এবং স্বীয় ক্ষমতায় আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ কর। প্রভু হে! মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের (আঃ) উপর দরূদ প্রেরণ কর এবং সঠিক পথে হেদায়াতের স্বাদ আমাকে আচ্ছাদন করাও যাতে ঐ পথ পরিবর্তন না করি এবং তদ্রূপ সৎপথের স্বাদ আমাকে আস্বাদন করাও যাতে কখনোই ঐ পথ থেকে বিচ্যুত না হই। আর পরিপক্ক নিয়্যতের স্বাদ আমাকে আস্বাদন করাও যাতে কোন সন্দেহ না থাকে। প্রভু হে! সমস্ত বৈশিষ্ট্য যা আমার ত্রুটি বলে পরিগণিত হয় সংস্কার করে দাও। আর আমার সমস্ত ত্রুটি যার জন্যে আমি অবাঞ্ছিত হই সেগুলোকে সৎগুণে পরিবর্তন করে দাও এবং সমস্ত সুগুণ যেগুলো আমার মধ্যে অপূর্ণ অবস্থায় আছে সেগুলোকে পরিপূর্ণ করে দাও।"

পঞ্চমত ঃ কিছু দোয়া আছে যেগুলো মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা পরিহার করার আবশ্যকতা এবং মানুষের নিকট অপমানিত না হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি সম্পর্কে দোয়া পাঠকারীকে শিক্ষা দান করে। আর তাকে শিক্ষা দান করে যে, স্বীয় বাসনার কথা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট বর্ণনা না করতে। অনুরূপ শিক্ষা দান করে যে, মানুষের বিষয় আশয়ের প্রতি লোভ করা হলো মানবতার জন্য নিকৃষ্টতার বৈশিষ্ট্য। যেমনটি আমরা সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার ২০তম দোয়ায় পাঠ করি-

> **"প্রভু হে! সংকটময় মুহূর্তে তুমি ভিন্ন অন্য কারো দারস্থ কর না। অনুরূপ প্রয়োজনের মুহূর্তে তুমি ভিন্ন অপর কারো নিকট আমাকে অবনত করো না। আমি যখন ভীতসন্ত্রস্ত হই তখনও আমাকে তোমা ভিন্ন অন্য কারো নিকট অবনত হতে অনুমতি দিও না যাতে করে (ঐ কাজ সম্পাদন করার কারণে) অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার উপযুক্ত না হয়ে যাই এবং তোমা হতে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমার থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে না নাও।"**

এছাড়া আমরা সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার ২৮তম দোয়ায় পাঠ করি-

> **"প্রভু হে! আমি পরিষ্কার ও নির্মলভাবে অন্যান্যদের থেকে দূরে সরে গিয়েছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি ও সমস্ত অন্তরাত্মা নিয়ে তোমার দিকে এসেছি। আর যারা তোমার করুণার মুখাপেক্ষী তাদের থেকে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। কারণ দেখলাম যে, অভাবী ও নির্ভরশীল কারো উপর নির্ভর করা বিবেক বুদ্ধি প্রসূত নয়।"**

অনুরূপ আমরা প্রাগুক্ত কিতাবেই ১৩তম দোয়ায় পাঠ করি-

> **"সুতরাং যদি কেউ তার প্রয়োজন তোমার নিকট থেকে পূরণ করার জন্য আবেদন করে এবং তোমার সাহায্যেই নিজেদের দারিদ্র দূর করে, তবে সে সঠিক কাজই করেছে এবং নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা উপযুক্ত স্থানেই বলেছে। কিন্তু যদি কেউ নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তোমার সৃষ্টি কোন কিছুর দ্বারস্থ হয় এবং ঐ বস্তুকে নিজের মুক্তির কারণ হিসেবে ধরে নেয় তবে সে নিজেকে হতাশায় পতিত করেছে এবং নিজেকে তোমার করুণার অনুপযুক্ত করেছে।"**

ষষ্ঠত ঃ কিছু দোয়া আছে যেগুলো মানুষকে অন্যদের অধিকার সংরক্ষণ ও মানুষকে সহযোগিতা করার বিষয়ে জ্ঞান দান করে। অনুরূপ অপরের প্রতি বন্ধুত্ব ও দয়া প্রকাশ করতে শিখায়। অপরের প্রতি ত্যাগ

তিতিক্ষা দেখানোর মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থ বাস্তব রূপ লাভ করে। যেমনটি আমরা ৩৮তম দোয়ায় পাঠ করি-

> **"প্রভু হে! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এজন্য যে আমার উপস্থিতিতে অন্যে অত্যাচারিত হয়েছে কিন্তু আমি তাকে সাহায্য করিনি। অনুরূপভাবে ক্ষমা চাইব যে আমাকে দয়া করা হয়েছে কিন্তু তার বিনিময়ে আমি কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি। ক্ষমা চাইব তার সম্পর্কে যে আমার নিকট স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন কিন্তু আমি তাকে ক্ষমা করিনি। ক্ষমা চাইব সে জন্য যে, আমার নিকট অভাবের কারণে এসেছে কিন্তু আমি তার জন্য কোন কিছু ত্যাগ করিনি এবং তার প্রয়োজন মিটাইনি। অনুরূপভাবে ক্ষমা চাইব সেই মুমিন সম্পর্কে আমার উপর যার অধিকার আছে কিন্তু আমি তার অধিকার রক্ষা করিনি; আর সে মুমিন সম্পর্কে যার ত্রুটি আমি জেনে গিয়েছি কিন্তু আমি তা গোপন রাখিনি।"**

এখন আমরা বেশ ভাল করেই জানি যে, ক্ষমা চাওয়ার এ পদ্ধতি সর্বাধিক স্বতঃসিদ্ধ যা অন্তরাত্মাকেও দায়িত্বগুলো সম্পাদন করার বিষয়ে অবহিত করে। আর তাকে শিক্ষা প্রদান করে যে, প্রত্যেক মানুষকেই এহেন সমুন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

অনুরূপ ৩৯তম দোয়ায় এ সমুন্নত চারিত্রিক গুণের পাঠ দান করে পাশাপাশি কিরূপে এমন কাউকে ক্ষমা করার জন্য তোমার নিজেকে বাধ্য করতে হবে যে তোমার সাথে দূর্ব্যবহার করেছে এবং ক্ষমা চেয়েছে। দোয়ায় বলা হয়-

> **"প্রভু হে! যে সকল মানুষ আমার সাথে দূর্ব্যবহার করেছে এবং আমাকে পীড়া দিয়েছে কিংবা অসম্মান করেছে, আর ঐ অত্যাচার যা আমার উপর করা হয়েছে তার পাপ নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে অথবা জীবিত আছে, সুতরাং আমাকে অসম্মান ও পীড়া দেয়ার কারণে যে পাপ হয়েছে সে পাপের ফলে তার ভোগান্তি হচ্ছে, তাকে ক্ষমা করে দাও। অনুরূপভাবে ঐ সকল গুনাহ যেগুলো আমার প্রতি অত্যাচার করার ফলে হয়েছে তা থেকেও তাকে ক্ষমা করে দাও। আর আমার সাথে যে যা করেছে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করো না। অনুরূপভাবে আমার সম্পর্কে কৃত তার কুকর্মগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিও না। আর আমার এ ত্যাগ ও সদকাকে (যা ক্ষমা ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে তার প্রতি প্রদর্শন করেছি) সর্বোত্তম ও পবিত্রতম সদকার অন্তর্ভূক্ত কর এবং সেই সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া বলে গণনা কর যার মাধ্যমে কেউ তোমার দরবারে নৈকট্য কামনা করে।**

আর আমার ঐ ক্ষমার বিনিময়ে তুমিও আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও এবং তাদের সম্পর্কে আমার দোয়ার বিনিময়ে তোমার রহমত আমার উপর বর্ষণ কর যাতে করে আমরা সকলেই তোমার করুণা ও রহমতে সফল ও কৃতকার্য হতে পারি।"

এ শেষোক্ত দোয়াটির বিষয়বস্তু কত সুন্দর ও কত মধূর যা সকল ভাল ও মন্দ সম্পর্কে মানুষকে পাঠদান করে। আর সেই সাথে আমাদেরকে শিখায় সকলের জন্য পরিশুদ্ধ নিয়্যাত করতে ও সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করতে। এমনকি যারা আমাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করেছে তাদের জন্য আমাদের সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ায় এ ধরনের বিষয়বস্তু অনেক বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের ঐশী শিক্ষা যা মানবাত্মাকে কুপ্রবৃত্তি ও কলুষতা থেকে পবিত্র করে তা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং যদি মানুষ হেদায়াত পেতে চায় তবে যেন ঐ দোয়াগুলো পাঠ করে।

৩৬. কবর যিয়ারত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

ইমামিয়াদেরকে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষায়িত করা যায় তা হলো মহানবী (সাঃ) ও ইমামগণের (আঃ) কবর যিয়ারত সম্পর্কে তাদের বিশেষ মনোযোগ, কবরসমুহের উপর সুবিশাল ইমারত নির্মাণ ও ঐগুলোকে অটুট রাখা ইত্যাদি। ইমামীয়া বা শিয়াদের এ সকল কর্মকান্ডের সবই ইমামগণের (আঃ) নির্দেশের বাস্তবায়ন ব্যতীত কিছুই নয়। তাঁরা (আঃ) স্বীয় অনুসারীদেরকে তাঁদের (আঃ) যিয়ারতের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা তাদের অনুসারীদেরকে এমন কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন যাতে অধিক সওয়াব বিদ্যমান। কারণ ইমামীয়ারা মনে করে এ কাজগুলো ওয়াজিব ইবাদতসমূহের পরেই গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ইবাদত বলে পরিগণিত হয়। ইমামীয়ারা আরো বিশ্বাস করে যে, এ কবরগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক দোয়া ও তাওয়াসসুল[*] কবুলের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান। আর এ আমলগুলোকে ইমামগণের (আঃ) নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন বলে তারা (শিয়ারা) বিশ্বাস করে।

---

[*] *হাজত পূরণের জন্য আল্লাহর অলীদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর নিকট চাওয়া।*

হাদিসে এসেছে "প্রত্যেক ইমামের (আঃ) প্রতি তাঁদের ভক্ত ও অনুসারীদের রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুতরাং ইমামগণের (আঃ) কবর যিয়ারতের মাধ্যমে তারা উত্তম আমলের দ্বারা তাদের কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতি পালন ও রক্ষা করে। সুতরাং যদি কেউ তাঁদের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁদের কবর যিয়ারত করে তবে প্রকৃতপক্ষে সে ইমামদের (আঃ) ইচ্ছারই বাস্তবায়ন করেছে। ফলে ইমামগণ (আঃ) তাদের শাফায়াতকারী হবেন।"

কবর যিয়ারতের মধ্যে যে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব লুক্কায়িত সে কারণেই এ ব্যাপারে ইমামগণ (আঃ) বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কারণ এর ফলে ইমামগণ (আঃ) ও তাঁদের ভক্তদের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। আর মানুষের অন্তরে ইমামগণের (আঃ) কীর্তি, আখলাক ও আল্লাহর পথে তাদের জিহাদের স্মরণকে পুনরুজ্জীবিত করে।

যিয়ারতের সময় মুসলমান যেখানেই বসবাস করুক না কেন একত্রে এক জায়গায় জমায়েত হয়। ফলে পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত ও প্রিয়ভাজন হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের অনুরাগ সৃষ্টি হয়। আর ইমামগণ (আঃ) থেকে বর্ণিত যিয়ারতনামার কথায় ও বিষয়বস্তুতে প্রকৃত তাওহীদের শিক্ষা এবং ইসলামের ও মোহাম্মাদী রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয় কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা এবং পবিত্র আখলাকের (নৈতিক চরিত্রের) শিক্ষা প্রদান করা হয়।

অনুরূপভাবে যিয়ারতের সময় যে পংক্তিগুলো আবৃত্তি করা হয় সেগুলো পবিত্র ইমামগণ (আঃ) কর্তৃক বর্ণিত দোয়াসমূহের মতই প্রভাব রাখে। এমনকি এ দোয়াগুলোর মধ্যে কোন কোনটি খুবই সাহিত্যমান সমৃদ্ধ ও সমুন্নততম দোয়া। যেমন- কথিত আছে যে, যিয়ারতে আমীনাল্লাহ ইমাম যয়নুল আবেদীন (আঃ) তাঁর দাদা হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (আঃ) কবর যিয়ারতের সময় পাঠ করেছিলেন। এ যিয়ারতনামাগুলো ইমামগণের (আঃ) অবস্থান ও মর্যাদা, সত্যের জন্য ও দ্বীনের নাম বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁদের (আঃ) ত্যাগ, মহান আল্লাহর প্রতি তাঁদের নির্মল আনুগত্য সম্পর্কে শীয়াদেরকে জ্ঞান দান করে। এ দোয়াগুলো সুন্দর ও

-বক্তব্যটি ইমাম রেজা (আঃ) এর যা ইবনে কুলাভেইয়ের কামিলুজযিয়ারত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রুতিমধূর আরবী ও সহজ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যাতে সাধারণ ও বিশেষ তথা সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়। এ যিয়ারতগুলো তাওহীদের সর্বোচ্চ অর্থ এবং মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম পরিচিতি সমন্বিত। আর তা শিক্ষা দেয় কিরূপে খোদার নিকট সাহায্য চাইতে হবে এবং কিরূপে দোয়া করতে হবে।

নিঃসন্দেহে এ যিয়ারতগুলো কোরআন এবং নাহজুল বালাগা ও ইমামগণ (আঃ) থেকে বর্ণিত দোয়ার পরই প্রকৃতপক্ষে সমুন্নত সাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। কারণ এগুলো সংক্ষেপে চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ও ধর্মীয় বিষয়ে ইমামগণের (আঃ) শিক্ষাকে তুলে ধরে। এছাড়া যিয়ারতের সংস্কৃতিতে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় যাতে দ্বীনের ঐ উচ্চতর অর্থগুলোর বাস্তবায়ন মুসলমানদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের উৎকর্ষ সাধনে কতটা উপযোগী তা তুলে ধরে সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে অপরের সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করতে ও পারস্পরিক সম্পর্ককে পছন্দ করতে উৎসাহিত করেছে। কারণ যিয়ারাতের সংস্কৃতিতে এমন কিছু আচার আছে যেগুলো যিয়ারতকারীকে পবিত্র যিয়ারতগাহতে প্রবেশ করার পূর্বে আনজাম দিতে হয় এবং কিছু কিছু আমল আছে যেগুলোকে যিয়ারতের সময় ও তৎপরে সম্পাদন করতে হয়। এখানে আমরা এমন কিছু আদব বা সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করব যাতে মুসলমানদেরকে উপরোল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারি।

(১) যিয়ারতের একটা আদব হলো এই যে, যিয়ারতকারীকে যিয়ারতের পূর্বে ইসলামী বিধান মোতাবেক গোসল করতে হয়। এর ফলে তার শরীরের ময়লা দূর হয়, রোগ-বালাই ও ক্লেশ প্রতিহত হয় যে কারণে অন্যেরা তার শরীরের দূর্গন্ধে কষ্ট পায় না।[1]

এ বাহ্যিক (যা শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট) কর্মকান্ড স্বীয় আত্মাকেও কদর্যতা এবং কলুষতা থেকে পবিত্র করে। কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, যিয়ারতকারী গোসল শেষে সেই সমুন্নত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলে-

---

[1] *আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আঃ) বলেন-"পানির দ্বারা তোমরা শরীরের দূর্গন্ধকে দূর করো। আল্লাহ তাদেরকে অপছন্দ করেন যারা তাদের শরীরের দূর্গন্ধ দিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়। (তোহাফুল উকুল পৃঃ ২১)*

"প্রভু হে! এ গোসলকে আমার জন্য শুভ্রতা ও পবিত্রতার কারণ কর, এর মাধ্যমে আমাকে যথার্থরূপে সকল রোগ, কষ্ট ও বালা থেকে নিরাপত্তাদান কর। আর এ গোসলের মাধ্যমে আমার অন্তর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাড়-মাংস, রক্ত, লোম, চর্ম, আমার মস্তিস্ক, আমার স্নায়ুকে পবিত্র কর এবং পবিত্র কর আমা হতে পৃথিবী যা গ্রহণ করেছে এবং আমার অভাব, দারিদ্র ও প্রয়োজনের সময়ে একে আমার জন্য সাক্ষী নির্ধারণ করে দাও।"

(২) যিয়ারতকারী গোসলান্তে সর্বোত্তম পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে। কারণ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করা এমন একটি উত্তম কর্ম যার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, একজনকে অন্যজনের নিকটবর্তী করে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং অনুষ্ঠানের মর্যাদার গুরুত্বের অনুভূতিকে বৃদ্ধি করে। এ শিক্ষায় যা লক্ষ্যনীয় তা হলো, কোন ব্যক্তির জন্য এটা জরুরী নয় যে সে সবার চেয়ে ভাল পোশাক পরিধান করবে বরং তার সাধ্যমত ভাল পোশাক পরিধান করবে। কারণ প্রত্যেকেই সকলের চেয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করতে পারে না। যদি তাই হত তবে তা দরিদ্রদের জন্য কষ্ট বয়ে আনবে যাকে ধর্মীয় ও মানবীয় বন্ধুত্ববোধ স্বীকৃতি দেয় না। স্মরণযোগ্য এ আদেশ এরূপ যে, একদিকে মানুষের পোশাকের সৌন্দর্য রক্ষা হয়, অপরদিকে পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে দরিদ্রদের অবস্থাকেও বিবেচনা করা হয়।

(৩) আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি মাখবে এবং এর সুফল পোশাক পরিধানের মতই।

(৪) যে মানদন্ডের ভিত্তিতে দরিদ্রকে সদকা দেয়া যেতে পারে,তার উপকারিতা হলো দরিদ্রজনকে সাহায্য করার পাশাপাশি দয়াদ্র আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা।

(৫) যিয়ারতকারী প্রশান্তচিত্তে ধীর স্থিরভাবে এগিয়ে চলে এবং নামাহরাম থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখে। এখানে জ্ঞাতব্য যে, যিয়ারতকারীকে হারাম শরীফের ও অন্যান্য যিয়ারতকারীদের সম্মান রক্ষা করতে হবে। তার একাগ্র মনোযোগ থাকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি। মানুষের সমস্যা সৃষ্টি থেকে সে দূরে থাকতে চায়, তাদের পথরোধ থেকে বিরত থাকতে চায়। অপরের সাথে সে অশিষ্ট আচরণ করতে চায় না।

(৬) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দেয় এবং যতবার ইচ্ছা এর পুনরাবৃত্তি করে। কোন কোন যিয়ারতে এর সংখ্যা একশবার বলা হয়েছে। এ তাকবীরের উপকারিতা হলো এই যে, এ তাকবীর উচ্চারণকারী মহান আল্লাহর মাহাত্মকে অনুভব করে এবং সে জানে যে, এ বিশ্ব জগতে তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। অন্তরে সে উপলব্ধি করে যে, এ যিয়ারত একমাত্র খোদার এবাদতের জন্যই করা হয় যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা এবং তাঁর স্মরণ ও তাঁর দ্বীনের উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(৭) মহানবীর (সাঃ) কিংবা ইমামগণের (আঃ) কবর যিয়ারত শেষে যিয়ারতকারী ন্যূনতম পক্ষে দু'রাকআত মোস্তাহাব নামায আদায় করে যাতে সে 'যে মহান আল্লাহ' তাকে এ যিয়ারতের তাওফীক দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে এবং নামাযের সওয়াবকে তাঁর উপর হাদিয়া করতে পারে যাকে সে যিয়ারত করেছে।

যিয়ারতকারী এ নামাযের পরে যে দোয়া পড়ে তা তাকে বুঝায় যে তার এ নামায ও আমল একমাত্র এক আল্লাহর জন্যই। আর এ যিয়ারতও কেবলমাত্র মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও পরশ লাভের মর্যাদা পাবার জন্যই। কারণ ঐ দোয়ায় সে পাঠ করে-

> **"প্রভু হে! তোমার জন্যই নামায আদায় করেছি, তোমার জন্যই রুকু সেজদা করেছি। কারণ তুমি হলে এক ও অদ্বিতীয়। তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং নামায, রুকু ও সেজদা একমাত্র তোমারই জন্য। প্রভু হে! মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের (আঃ) উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর এবং আমার এ যিয়ারতকে কবুল কর। আর মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের (আঃ) কারণে আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর।"**

অতএব, যদি কেউ ইমামগণ (আঃ) ও তাঁদের অনুসারীদের কবর যিয়ারতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায় (যারা যিয়ারতের ক্ষেত্রে ইমামগণেরই (আঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করে) সে যেন এ ধরনের আদব ও কর্মকান্ডের দিকে লক্ষ্য করে এবং নির্বোধরা যা ধারণা করে সেদিকে যেন মনোযোগ না দেয়। অজ্ঞদের ধারণা এ যিয়ারতগুলো প্রকারান্তরে কবরেরই এবাদত এবং কবরবাসীর নৈকট্য কামনা যা হলো মহান আল্লাহর শরীক করা।

কিন্তু আমার জানা মতে এ ধরনের কর্মকান্ড ইমামীয়া সমাজকে পবিত্র করার নিমিত্তেই সম্পাদিত হয়। কারণ যিয়ারতানুষ্ঠানের সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বহুবিধ কল্যাণ বিদ্যমান। আর এ কাজগুলো আহলে বাইতে (আঃ) শত্রুদের চোখে কাঁটার মত। নতুবা আমরা বিশ্বাস করি যে তারা এ ধরনের যিয়ারতের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের (আঃ) লক্ষ্যের হাকীকাত সম্পর্কে অজ্ঞ। কারণ আহলে বাইতের ইমামগণ (আঃ) ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ যারা স্বীয় নিয়্যাতকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই পরিশুদ্ধ করেছেন, স্বীয় এবাদতে তাঁরা (আঃ) কেবলমাত্র মহান আল্লাহর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং একমাত্র দ্বীনের সাহায্যের জন্যই তাঁদের সমস্ত জীবনের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করেছেন। এমতাবস্থায় কিরূপে কল্পনা করা যায় যে, এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ মুসলমানদেরকে এবাদতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর অংশীকরণের দিকে আহবান করেছেন?

(৮) যিয়ারতের অপর একটি বিশেষ আদব হলো যে সে যেন অপরাপর যিয়ারতকারীর সাথে সদাচরণ ও আদব সহকারে কথা বলে এবং স্বল্প কথা বলে এবং সেইসাথে লক্ষ্য রাখে তার সে কথাগুলোও যেন সুকর্ম ও কল্যাণ সংশ্লিষ্ট হয় এবং অধিকাংশই আল্লাহর স্মরণ বা যিকর[১] হয়। সে যেন বিনম্রভাবে খোদার ভয়ে ভীত হয় এবং অধিকাংশ সময়ই মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর দরূপ পাঠ করে। চক্ষুযুগলকে খারাপ দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রাখে, দ্বীনী ভাইদের অভাব পূরণ করে এবং তাদের প্রতি সদয় হয় ও ধৈর্য ধারণ করে, আর ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ হয়েছে তা থেকে দূরে থাকে। সে অপরের সাথে শত্রুতা ও দুশমনী করে না এবং অতিরিক্ত কসম করে না, আর অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় না যেখানে কসমের ব্যবহার অধিক।[২]

---

[১] *যিকর মানে এ নয় যে সে তাসবীহ ও তাকবীরের পুনরাবৃত্তি করবে বরং এর উদ্দেশ্য হলো যা ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি কোন কোন হাদীসে 'খোদাকে অধিক স্মরণ কর'- এ আয়াতের তাফসীরে বলেন- "আমি বলি না যে, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর- এ কথাটি বেশী বেশী বল যদিও এটি যিকর। বরং মহান আল্লাহকে স্মরণ কর প্রতি মুহূর্তে আনুগত্যে কিংবা গুনাহে (তাওবার মাধ্যমে)। (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করা আবশ্যক)।"*

[২] *কামিলুয যিয়ারতের পৃ ঃ ১৩১ দ্রঃ।*

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে যিয়ারত হলো মহানবী (সঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের ইমামগণের (আঃ) প্রতি সালাম উৎসর্গ করা। আর তা এ বিশ্বাসের কারণে যে, "তাঁরা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট জীবিত এবং রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছেন।" সুতরাং তাঁরা অপরের কথা শুনতে পান এবং তার জবাব দিয়ে থাকেন। অতএব এটুকু বলা যথেষ্ট- "আপনার উপর সালাম হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!" উত্তম হলো ইমামগণের (আঃ) নিকট থেকে যে দোয়াসমূহ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পাঠ করা। কারণ যেমনটি ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, ঐ দোয়াগুলোতে সাহিত্যমান, বাগ্মিতা ও শ্রুতিমধুরতা ছাড়াও নৈতিক ও সামাজিক সমুন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও অপরিসীম ধর্মীয় কল্যাণ বিদ্যমান যার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি বেশী মনোযোগী হবে।

৩৭. মহানবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতের (আঃ) নিকট তাশাইয়্যুর অর্থ ঃ

আহলে বাইতের ইমামগণ (আঃ) যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেন -যদিও তাঁরা (আঃ) তা হস্তগত করার জন্য কোন পরিকল্পনাও করেন নি- তখন তাঁদের (আঃ) নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি ও ঐরূপ সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁদের নিকট চেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা (আঃ) সমস্ত ভক্তবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তবে তাঁদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছিল শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেয়া ও মোহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা প্রচার করা। আর তাঁরা তাঁদের অনুসারীদেরকে যা তাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। এমন কোন ব্যক্তি ইমামগণের (আঃ) অনুসারী বলে পরিগণিত হত না যদি না সে মহান আল্লাহর অনুগত হত, কুমন্ত্রণা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে দূরে থাকত এবং ইমামগণের (আঃ) শিক্ষা ও পথনির্দেশনা মেনে চলত।

তাঁরা কখনোই বলতেন না যে, শুধুমাত্র তাঁদেরকে (আঃ) ভালবাসা মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। যেমন কিছু মানুষ আছে যারা কুপ্ররোচনার দিকে ধাবিত হয়, মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে অথচ মনে করে যে, কেবলমাত্র ইমামগণের (আঃ) ভক্তিই তাদের গুনাহ মাফের কারণ হবে। কিন্তু ইমামগণ (আঃ) তাঁদের ভক্তিকেই এবং বেলায়াত (অভিভাবকত্ব) কবুল

করাকেই নাজাতের উসিলা মনে করেন না। কেবলমাত্র তখনই ইমামগণের (আঃ) প্রতি ভক্তি তার মুক্তির মাধ্যম হতে পারে যখন তার সাথে তার সৎকর্ম যোগ হবে। যখন সে সততা, বিশ্বাস, আমানতদারিতা ও তাকওয়ার অধিকারী হবে। কারণ স্বয়ং ইমামগণ (আঃ) পুনঃপুনঃ বলেছেন-

> **"হে খিসামা! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের অনুসারীদের কাছে একথা পৌঁছে দাও যে আমাদের প্রতি ভক্তি তাদেরকে খোদার মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে না। তারা যেন আমল করে এবং কেউ আমাদের বেলায়াতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না তাকওয়া ব্যতীত।"**

পুনরায় বলেছেন-

> **"কিয়ামত দিবসে সর্বাধিক আফসোস ও কষ্ট থাকবে তাদের যারা ন্যায়ের বর্ণনা দান করে কিন্তু স্বয়ং অপরের প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করে না।"**[৭]

ইমামগণ (আঃ) সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসারীদের নিকট চাইতেন তারা যেন মানুষের মধ্যে সত্যের আহবানকারী হয় এবং মানুষকে কল্যাণ ও মুক্তির দিকে আহবান ও পথ নির্দেশনা দান করে। তাঁরা (আঃ) কর্মের মাধ্যমে আহবানকে কথার চেয়ে বেশী ফলপ্রসু বলে মনে করতেন। ইমামগণ (আঃ) বলেন-

> **"মানুষের জন্য সত্যের প্রতি আহবানকারী হও আমলের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে নয়, যাতে মানুষ কার্যতঃই তোমাদের প্রচেষ্টা, সততা ও তাকওয়া দেখতে পায়।"**[৮]

আমরা এখন আপনাদের জন্য কিছু কথোপকথনের উল্লেখ করব যেগুলো তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন অনুসারীদের সাথে করেছেন।

(১) জাবির জো'ফীর সাথে হযরত আবুজাফর ইমাম বাকের (আঃ) এর কথোপকথন -

"হে জাবির! তুমি কি মনে কর যারা আমাদের বন্ধুত্বে বিশ্বাসী তারা আমাদের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। না, আল্লাহর শপথ! আমাদের প্রকৃত অনুসারী তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে। আমাদের অনুসারী হলো তাঁরা যারা বিনয়ী, আমানতদার,

---

৭ - উসুলে কাফি, কিতাবে ঈমান, যিয়ারতে এখওয়ান অধ্যায়।

৮ উসূলে কাফি, বাবে তায়াত ও তাকওয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আল্লাহর অধিক স্মরণকারী, রোজাপালনকারী, নামাযী, পিতামাতার প্রতি সদাচারণকারী এবং দরিদ্র, মিসকীন, ঋণগ্রস্থ, ইয়াতীম প্রতিবেশীদের প্রতি প্রতিবেশী সুলভ কর্তব্য পালনকারী বলে পরিচিত। তারা হবে সৎ, কোরআন পাঠকারী! তারা কথার দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয় না, কারো ক্ষতি করে না! তারা ভাল কথা বলে। স্বগোত্র ও অন্যদের রক্ষাকারী, তাদের ধন সম্পদের আমানত রক্ষাকারী। সুতরাং হে অনুসারীরা! খোদাকে ভয় কর, তাঁর আদেশগুলোকে পালন কর। কারণ খোদা ও বান্দাদের মধ্যে কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব নেই। বরং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত বান্দা সে-ই যে সর্বাধিক পরহেজগার এবং সর্বাধিক অনুগত।"

পুনরায় তিনি বলেন-

"হে জাবির! আল্লাহর শপথ কেউ আল্লাহর নৈকট্য পাবে না কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত। আমরা কাউকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিতে পারব না এবং মহান আল্লাহর সম্মুখে কারোরই কোন অজুহাত নেই। হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহর আনুগত্য করে তবে তারা আমাদের প্রিয়ভাজন। আর যদি কেউ মহান আল্লাহর অবাধ্য হয় তবে সে আমাদের শত্রু। কেউই তাকওয়া ও সৎকর্ম না করে আমাদের বন্ধুত্ব ও বেলায়াতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না।"

(২) ইমাম বাকির (আঃ) ও সাঈদ ইবনে হাসানের মধ্যকার কথোপকথন-

ইমাম ঃ ওহে তোমাদের মধ্যে এমন ঘটনা কি ঘটে যে কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছে এসে তার ভাইয়ের ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের প্রয়োজনমত অর্থ তুলে নেয় অথচ তার ভাই তাকে বাধা দেয় না?

সাঈদ ঃ না, এমন ঘটনার কথা আমি জানিনা।

ইমাম ঃ সুতরাং তোমাদের মধ্যে প্রকৃত দ্বীনী ভ্রাতৃত্ববোধের কোন অস্তিত্ব নেই।

সাঈদ ঃ তবে কি এমতাবস্থায় আমরা ধ্বংসের পথে আছি?

ইমাম ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কারণ এরূপ ব্যক্তি যা বলে নিজে তা করে না। ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ ইসলামী আহকাম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৩) আবু সালেহ কেনানীর সাথে হযরত ইমাম সাদিকের (আঃ) কথোপকথন-

কেনানী ঃ আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের কারণে লোকজন কতভাবে যে আমাদেরকে তিরস্কৃত করে।

ইমাম সাদিক (আঃ) ঃ লোকজন তোমাদেরকে কিভাবে তিরস্কার করে?

কেনানী ঃ যখন আমাদের সাথে অন্যদের কথোকপকথন হয় তখন বলে 'এই খবিস জাফরী!'

ইমাম সাদিক (আঃ) ঃ লোকজন তোমাদেরকে কি আমাদের শিয়া (অনুসারী) হওয়ার কারণে মন্দ বলে?

কেনানী ঃ হ্যাঁ।

ইমাম সাদিক (আঃ) ঃ আল্লাহর শপথ! আমার প্রকৃত অনুসারী তোমাদের মধ্যে সংখ্যায় অতি নগণ্য। আমার প্রকৃত অনুসারী হলো- তারা যাদের তাকওয়া অতি দৃঢ়, যারা স্বীয় প্রভুর আনুগত্য করে এবং মহান আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা রাখে। হ্যাঁ, এরাই আমার প্রকৃত অনুসারী।

(৪) হযরত সাদিক (আঃ) এ ধরনের অনেক কথা বলেছেন। নিম্নে এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু তুলে ধরছি ঃ

(ক) এমন কেউ আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় ও কল্যাণের অধিকারী নয় যদি সে এক লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত কোন শহরে বসবাস করে, আর ঐ শহরে এমন অন্য কোন ব্যক্তিও আছে যে তার চেয়ে বেশী পরহেজগার।

(খ) আমরা কাউকে মূমিন বলে মনে করি না যদি না সে আল্লাহর সকল আদেশ পালন করে চলে এবং সবগুলো হুকুমের প্রতি উৎসাহিত হয়। মনে রেখ, আমাদেরকে অনুসরণের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো তাকওয়া ও পরহেজগারী। সুতরাং তাকওয়া ও সদগুণ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করো যাতে আল্লাহ তোমাকে স্বীয় রহমতের অন্তর্ভূক্ত করেন।

(গ) সে আমাদের শিয়াদের অন্তর্ভূক্ত নয় যার সম্পর্কে পবিত্র নারীরা তাদের নিজেদের কথোপকথনের মধ্যে তার পবিত্রতা ও সংযমের কথা স্মরণ করে না। সে আমাদের শিয়াদের মধ্যে নয় যে দশহাজার অধিবাসীর কোন জনপদে বসবাস করে, আর সেখানে এমন অন্য কেউ আছে যে তার থেকে বেশী সংযমী।

(ঘ) প্রকৃতপক্ষে জাফরী শিয়া সেই যে তার উদর ও যৌন কামনাকে অনুসরণ করে না। জাফরী শিয়ারা দ্বীনের পথে ত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং তাঁর নিকট উত্তম পুরস্কারের আশা করে। আর তারা তাঁর আজাবের ভয় করে। যদি এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাও তবে জেনে রেখ সে আমাদের শিয়া।

৩৮. অত্যাচার ও অবিচার থেকে দূরে থাকা ঃ

ইমামগণ (আঃ) কঠোরভাবে যে মহাপাপে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন তা হলো অন্যের অধিকার হরণ করা ও অত্যাচার করা। আর ইমামগণের (আঃ) এ আদেশ কোরআনের সে আয়াতেরই প্রতিফলন যাতে জুলুম-অত্যাচারে কদর্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে-

> **"মনে করোনা যে মহান আল্লাহ অত্যাচারীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে বেখবর। বরং তাদের শাস্তিকে সে দিন পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন, যেদিন চক্ষুগুলো ভয়ে পেরেশান হবে।"** (সূরা ইব্রাহীম আয়াত - ৪২)

হযরত আলী (আঃ) জোর-জুলুমের কদর্যতা সম্পর্কে কঠোর ভাষায় নাহজুল বালাগায় ২১৯ নং খোতবায় বলেছেন-

> **"যদি সাত আসমান ও এর নিম্নে যা কিছু আছে তা আসমান ও এর নিম্নে যা কিছু আছে তা আমাকে এজন্য দেয়া হয় যে, কোন পিঁপড়ার মুখ থেকে যবের একটি খোসা ছিনিয়ে নিতে হবে, আর এর দ্বারা খোদার অবাধ্য হতে হবে তবে আল্লাহর শপথ কখনোই আমি তা করব না।"**

জুলুম-অত্যাচার থেকে দূরে থাকার জন্য এখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এর কদর্যতাকে মানুষ এ পর্যায়ে অনুধাবন করতে পারে, যেখানে পিঁপড়ার মুখ থেকে যবের খোসা পরিমাণ বস্তুও কেড়ে নিতে নারাজ। এমনকি সাত আসমানের বিনিময়েও।

এমতাবস্থায়, যারা মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছে এবং তাদের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, তাদের সম্মান ও যশ ঘৃণাভরে বিনষ্ট করেছে তাদের অবস্থা কী হবে? যারা এমন, কি করে তাদের আমলকে আমীরুল মুমিনীন আলীর (আঃ) আমলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে? কিরূপে ঐ ধরনের ব্যক্তিরা হযরতের (আঃ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিষ্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে? সত্যিই আলী (আঃ) এর আচরণ হলো ধর্মীয় শিক্ষার সমুজ্জ্বল উদাহরণ যা ইসলাম মানবতার মাঝে সঞ্চারিত করতে চায়।

হ্যাঁ, জুলুম হলো সবচেয়ে বড় পাপ যা মহান আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। এ কারণেই আহলে বাইতের (আঃ) দোয়া ও রেওয়ায়েতে এ কাজটি সর্বাধিক ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে এবং এর কদর্যতাগুলি বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র ইমামগণ (আঃ) ও তাঁদের অনুসারীদেরকে কঠোর ভাষায় জুলুম থেকে বিরত থাকতে বলতেন। ইমামদের (আঃ) এ আচরণ শুধু তাদের শীয়াদের সাথে ছিল না বরং যারা তাদের উপর জুলুম করেছিল, রূঢ়তা দেখিয়েছিল তাদের সাথেও তাঁরা (আঃ) একই রূপ আচরণ করতেন।

ইমাম হাসানের (আঃ) ধৈর্য সম্পর্কিত বিখ্যাত ঘটনাটি উপরোক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐ ঘটনার বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, শামের কোন এক ব্যক্তি ইমামকে (আঃ) অপমান করে কথা বলেছিল ও বিদ্বেষপূর্ণ অপবাদ দিয়েছিল। তথাপি ইমাম (আঃ) তার সাথে কোমল ও বিনম্র আচরণ করেছিলেন যাতে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে তার কুৎসিত কর্ম সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন। কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে আমরা সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার দোয়া পড়েছিলাম যাতে দেখতে পেয়েছি কিরূপে ইমাম তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করেছিলেন যারা মানুষের উপর জুলুম করেছে, আর তাঁরা (আঃ) শিক্ষা দিয়েছেন কিরূপে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। তবে শরীয়তগতভাবে সীমা লংঘনের ক্ষেত্রে অত্যাচারীদেরকে অভিশম্পাত দেয়া জায়েয। তবে এ কাজটি জায়েয হওয়া এককথা আবার ক্ষমা যা সমুন্নত আখলাকের অন্তর্ভূক্ত তা অন্যকথা।

এমনকি ইমামগণের (আঃ) মতে অত্যাচারীকে অভিশাপ দেয়ার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করাও স্বয়ং জুলুম।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন-

> **"কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হলে যদি সে অত্যাচারীকে মাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণ অভিশাপ দেয় তবে সে স্বয়ং অত্যাচারে লিপ্ত হয়।"**

অবাক ব্যাপার! যখন অত্যাচারীকে অভিশাপ দেয়ার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করলে জুলুম বলে পরিগণিত হয় তখন আহলে বাইতগণের (আঃ) দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তির স্থান কোথায় যে ব্যক্তি স্বয়ং সজ্ঞানে জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত হয় কিংবা অপরের মান-সম্মানের হানি করে অথবা তাদের মালামাল লুট করে, অন্য অত্যাচারীদের নিকট মানুষের বদনাম করে যাতে সেই অত্যাচারীরা মানুষের উপর খারাপ ধারণা করে কিংবা শঠতা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে মানুষের কষ্টের কারণ হয় অথবা গুপ্তচরের হাতে মানুষকে বন্দী করে? কারণ এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ মহান আল্লাহর দরবারে সর্বাধিক অভিশপ্ত। তাদের পাপ ও শাস্তি অন্য সকলের চেয়ে কঠিন। আর আমল ও আখলাকের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।

৩৯. অত্যাচারীদের সহযোগিতা না করা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

যেহেতু জুলুম ও অত্যাচার সবচেয়ে বড় পাপ ও বিচ্যুতি এবং এর পরিণামও অত্যন্ত কুৎসিত তাই মহান আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে সাহায্য করা ও শক্তিশালী করার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন-

"অত্যাচারীদের সাথে বন্ধুত্ব ও তাদেরকে সহযোগিতা করো না। তাহলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং কেউই তোমাদেরকে সাহায্য করবে না।" (সূরা হুদ - ১১৩)

অত্যাচারীদেরকে ঘৃণা করা এবং সাহায্য ও সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এটাই হলো কোরআন ও আহলে বাইতের (আঃ) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। তাদেরকে শক্তিশালী করা, তাদের অত্যাচারে অংশগ্রহণ করা, তাদেরকে সাহায্য করা বর্জনীয় এমনকি খোরমার অর্ধাংশ পরিমাণও। ইমামগণ (আঃ) থেকে এমন অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল অত্যাচারীদের সহযোগিতা করা এবং তাদের কুকর্মকে না দেখা। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, এমনকি তাদের সাথে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের জুলুম-অত্যাচারেও তারা সহযোগিতা করেছিল। সত্যিই কতটা অপরাধ, কলুষতা ও সত্য থেকে বিচ্যুতি মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল! আর এর বিষাক্ত প্রভাবে ধীরে ধীরে মুসলমানরা দুর্বল হয়েছে ও তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। অদ্য মুসলমানদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, দ্বীন ইসলামের পরিচয় মুছে গিয়েছে। এমন মুসলমান কিংবা মুসলমান নামধারীরা এবং যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার অধিকারী হতে পারে না। তারা আল্লাহর সাহায্য থেকে আজ যখন এমনভাবে বঞ্চিত হয়েছে যে ইহুদিদের মত দুর্বল ও নিকৃষ্টতম শত্রু ও অত্যাচারীদের মোকাবেলা করতেও অপারগ তখন শক্তিশালী ক্রুশধারীদের মোকাবেলার কথাতো বলাই বাহুল্য।

যে সকল কর্মকান্ড অত্যাচারীদের সাহায্যের কারণ হত পবিত্র ইমামগণ (আঃ) যথাসাধ্য তাদের শীয়া বা অনুসারীদেরকে তা থেকে দূরে থাকতে বলতেন। আর কঠোরভাবে তাদের বন্ধুদেরকে অত্যাচারীদের প্রতি

ন্যূনতম সহযোগিতা ও সখ্যতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করতেন। এ সম্পর্কে তাদের অগণিত বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এর বক্তব্য এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। মোহাম্মদ ইবনে মোসলেম যোহরীর কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি তাকে অত্যাচারীদের অত্যাচারের সহযোগিতা হয় এমন কর্ম পরিহার করার কথা বলতে গিয়ে বলেন-

"ওহে তোমাকে কি তারা এজন্য নিমন্ত্রণ করেনি যে, তোমাকে তাদের জুলুমের যাতার কেন্দ্রকাঠি বানাবে, তাদের মন্দ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তোমাকে পুল বানাবে, পথভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সিঁড়ি বানাবে এবং তাদের জুলুমের আহবায়ক ও প্রচারক বানাবে? তারা তোমাকে তাদের মাঝে নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদেও হৃদয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আর তোমার দ্বারা অজ্ঞদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করেছে। তাদের কুকর্মকে সুকর্ম হিসেবে প্রচার করেছে এবং নিজেদের দিকে বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তোমাকে ব্যবহার করে। এমনটি তাদের অতি নিকটবর্তী মন্ত্রী ও শক্তিশালী সহযোগীর থেকেও পায়নি। তুমি যা পেয়েছ তা, যা তুমি দান করেছ তদপেক্ষা অতি সামান্য। এটি অতি সামান্য তার তুলনায় যে পরিমাণ অশ্লীলতা ও অন্যায় তোমার মাধ্যমে তারা বপন করেছে। তোমার নিজের কথা ভাব। কারণ তুমি ব্যতীত কেউই এ সম্পর্কে ভাববে না। নিজেকে এমনভাবে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করাও যেমনভাবে একজন দায়িত্বশীল ও দায়িত্ব পরায়ণ ব্যক্তি হিসাব করে থাকে।"[৭৩]

এই যে শেষ বাক্যটি "নিজেকে এমনভাবে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করাও যেমনভাবে একজন দায়িত্বশীল ও দায়িত্ব পরায়ণ ব্যক্তি হিসাব করে থাকে" একটি বৃহৎ কথা। কারণ কুপ্রবৃত্তি মানুষের উপর জয়লাভ করার পর মানুষ তার অন্তরের গভীরে আত্মসম্মানের হানি ঘটায় এর ফলে সে নিজেকে স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী মনে করে না এবং নিজের সকল কর্মকেই ক্ষুদ্র ভেবে মনে করে তার কৃতকর্মের জন্য তাকে হিসাব দিতে হবে না অর্থাৎ নিজেকে হিসাব কিতাবের ঊর্ধে মনে করে। এ ধরনের পন্থা অবলম্বনের রহস্য হলো তার নফসে আম্মারা বা মন্দকর্মপ্রবণ প্রতারক মন।

অতএব, ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এখানে যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো যোহরীকে এ আত্মিক রহস্য সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করা যা

---

[৭৩] *তোহাফুল উকুল পৃঃ ৬৬ ।*

সর্বদা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, যাতে তার উপর খেয়াল খুশী চেপে না বসে আর সে তার দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হয়।

উপরে বর্ণিত বিষয়ে আরো অধিক শক্তিশালী বর্ণনা হলো উটের মালিক সাফওয়ানের সাথে ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আঃ) এর কথোপকথন। সাফওয়ান ছিলেন সপ্তম ইমামের (আঃ) অনুসারী এবং হাদীসের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী যিনি হযরত (আঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

বিশিষ্ট রেজালশাস্ত্রবিদ কাশশী তার রেজালগ্রন্থে সাফওয়ানের জীবনীতে কথোপকথনটি নিম্নরূপে বর্ণণা করেছেন-

ইমাম ঃ হে সাফওয়ান ! তোমার সমস্ত কর্মকান্ডই উত্তম কেবলমাত্র একটি কাজ ব্যতীত।

সাফওয়ান ঃ আপনার জন্য উৎসর্গিত হব ঐ কাজটি কী?

ইমাম ঃ এই যে নিজের উটগুলোকে হারুনুর রশিদকে ভাড়া দাও।

সাফওয়ান ঃ আল্লাহর কসম! আমি আমার উটগুলোকে কোন হারাম ও বাতিল কর্মকান্ড বা শিকার ও আরাম-আয়াশের জন্য ভাড়া দেই না। বরং মক্কার পথ অতিক্রম করার জন্য ভাড়া দিয়েছি। আমি নিজেও তার সাথে যাইনা। আমার গোলামদেরকে পাঠাই।

ইমাম ঃ ওহে সাফওয়ান! তোমার ভাড়া পরিশোধের শর্ত কি তার ফিরে আসার শর্তসাপেক্ষ?

সাফওয়ান ঃ আপনার জন্য উৎসর্গ হব। জী হ্যাঁ।

ইমাম ঃ তুমি কি পছন্দ কর না সে জীবিত ফিরে আসুক, যাতে তোমার ভাড়ার টাকা তোমার নিকট পৌছে?

সাফওয়ান ঃ জী- হ্যাঁ।

ইমাম ঃ যদি কেউ তাদের জীবিত থাকা পছন্দ করে, সে তাদের দলভূক্ত এবং জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।

সাফওয়ান ঃ আমি ফিরে গিয়ে আমার সব উটগুলোকে একবারে বিক্রি করে দিলাম।

হ্যাঁ, যেখানে কেবলমাত্র অত্যাচারীর জীবনে বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করা পর্যন্ত গুনাহ বলে পরিগণিত হয়, সেখানে এটা পরিষ্কার যে,

যারা নিয়মিত জালিমদেরকে সাহায্য করে, তাদের জুলুম ও অত্যাচারকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের অবস্থা কী হবে? সেখানে যারা তাদের কর্মকান্ডের অংশীদার তাদের কথাতো বলাই বাহুল্য।

৪০. অত্যাচারী শাসকদের প্রশাসনে দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস ঃ

যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করেছিলাম যে, যখন অত্যাচারীকে খোরমার অংশবিশেষ পরিমাণ সহযোগিতা করা এবং এমনকি তাদের জীবিত থাকাটা পছন্দ করা ও পবিত্র ইমামগণ (আঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। তখন এ ধরনের প্রশাসনে অংশ গ্রহণকারী এবং বিভিন্ন মর্যাদা ও পদ গ্রহণকারীর অবস্থাতো বলাই বাহুল্য।

তদুপরি যারা এ ধরনের হুকুমত গড়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে এবং উক্ত হুকুমতকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে তাদের অবস্থাও সুস্পষ্টতর। কারণ যেমনটি ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন-

> **"জালিমদের প্রশাসন সকল সত্য বিধান ধ্বংস হওয়ার কারণ এবং বাতিলকে জীবিত করা আর অত্যাচার ও অশ্লীলতা প্রকাশের কারণ।"**[১০]

তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইমামগণ (আঃ) এ ধরনের পদ গ্রহণ করাকে জায়েয মনে করেছেন। যে সকল ক্ষেত্রে অত্যাচারী শাসকের প্রশাসনে পদ নেয়ার ফলে ন্যায়পরায়ণতা এবং বিচার প্রতিষ্ঠা ও মুমিনদের কল্যাণ করা যায়, আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার পথ সুগম হয় সে ক্ষেত্রে তা জায়েয।

যেমন ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আঃ) এক হাদীসে বলেন-

> **"অত্যাচারীদের দরবারে মহান আল্লাহর এমন কেউ আছে যাদের মাধ্যমে তিনি তাঁর হুজ্জাত মানুষের নিকট স্পষ্ট করে দেন। আর তিনি রাজ্য বা শহরে তাদেরকে ক্ষমতা দান করেন যাতে তাদের মাধ্যমে নিজের ওলীদেরকে সাহায্য করতে পারেন এবং কুকর্মকে দমন করতে পারেন ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়কে তাদের মাধ্যমে সংস্কার করতে পারেন। এ**

---

[১০] *তোহাফুল উকুল গ্রন্থ অনুসারে।*

ধরনের ব্যক্তিবর্গ সত্যিকারের মুমিন। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নূর।"

এ প্রসংগে পবিত্র ইমামগণ (আঃ) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেখানে এধরনের হুকুমতের পদাধিকারীদের জন্য সঠিক পথের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন- আহওয়াযের শাসক আব্দুল্লাহ নাজ্জাশীর নিকট ইমাম সাদিকের চিঠি ওয়াসায়েলুশশিয়া নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মরহুম হুররে আমেলীর উক্ত গ্রন্থের কিতাবুল বেঈ এ ৭৭ নং অধ্যায়ে এ চিঠিটি বর্ণিত হয়েছে।

৪১. ইসলামী ঐক্যের আহবান সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

ইসলামের মহত্ত ও একে অক্ষত রাখার ব্যাপারে কঠোর ইচ্ছার ক্ষেত্রে আহলে বাইতগণ (আঃ) বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা মানুষকে ইসলামের সম্মান, মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করতে এবং নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ অন্তর থেকে দূর করতে আহবান করতেন। আমীরুল মূমিনীন হযরত ইমাম আলীর (আঃ) সাথে পূর্ববর্তী খলিফাদের আচরণ ভুলে যাওয়ার মত নয়। যদিও ঐ মহাত্মা নিজেকে খেলাফতের অধিকারী মনে করতেন এবং তাদেরকে খেলাফত হরণকারী বলে জানতেন। তথাপি ইসলামী ঐক্য রক্ষার জন্য তাদের সাথে তিনি সম্পর্ক রক্ষা করতেন। এমনকি তিনি যে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক সর্বসমক্ষে খলিফা ঘোষিত হয়েছিলেন তা তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বর্ণনা করেননি। অবশ্য যখন হুকুমত তাঁর কাছে এসেছে তখন বর্ণনা করেছেন। আর রাহবাহ নামে খ্যাত দিবসে যেদিন রাসূল (সাঃ) এর ঐ সকল জীবিত সাহাবীদের নিকট সাক্ষী চেয়েছিলেন যারা গাদীর দিবসে রাসূল (সাঃ) কর্তৃক তার নিযুক্তির ঘটনা দেখেছেন এবং শুনেছেন যাতে তারা তাঁর নিযুক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন।

হযরত আলী (আঃ) যা কিছু ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর, তা তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে

'ওয়াসায়েলুশশিয়া' হাদীস গ্রন্থটি শরীয়তের বিভিন্ন আহকামের সমাহারে মহান গবেষক হুররে আমেলী লিখেছেন যার প্রসঙ্গে আল্লামা নুরী মোসতাদরাক অংশ সংযোজন করে ১৩৭৮-১৩৮১ হিঃ পাঁচ খন্ডে প্রকাশ করেছেন।

বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যেমনটি তিনি তাঁর এক খোতবায় তাঁর সময়কালের পূর্বের হুকুমত সম্পর্কে ইশারা করেছেন। তিনি বলেন-

> **"যদি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য না করি তবে আমার ভয় হচ্ছিল যে ইসলামে ফাঁটল ধরবে ও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।"**

একারণেই হযরত আলীর (আঃ) পূর্ববর্তী খলিফাদের খেলাফতের সময়কালে তার (আঃ) পক্ষ থেকে কথায় ও কর্মে কখনোই এটা পরিদৃষ্ট হয়নি যে, তিনি তাদের খেলাফতকে দুর্বল করতে চেয়েছেন কিংবা ক্ষতি করতে চেয়েছেন। যদিও তিনি খলিফাদের কর্মকান্ডের প্রতি নজর রাখতেন তথাপি স্বীয় অন্তরাত্মার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে গৃহকোণে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ সকল নিরবতা ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র এ জন্যই ছিল যে, বিশ্বজনীন ইসলাম রক্ষা পায় কিংবা এজন্য যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ঐক্যের প্রাসাদের কোন ক্ষতি না হয় বা তা বিনষ্ট না হয়। হযরতের (আঃ) এ বিবেচনার ব্যাপারটি সকলেই বুঝত। আর তাই ওমর ইবনে খাত্তাব প্রায় বলতেন-

> **"এমন কোন সমস্যায় পড়িনি যেখানে আবুল হাসান (আলী) ছিলেন না এবং সমাধান দেননি।"**

কিংবা বলতেন-

> **"যদি আলী না থাকত তবে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।"**

ইমাম হাসান (আঃ) এর অনুসৃত পদ্ধতি ভুলে যাওয়ার মত নয় যে কিরূপে তিনি ইসলামকে রক্ষা করার জন্য মোয়াবিয়ার সাথে চুক্তি করেছিলেন। কারণ তিনি দেখলেন যে যুদ্ধের জন্য পীড়াপিড়ি করলে মহান আল্লাহর অতি ভারী বস্তু কোরআন ও ইসলামী হুকুমত অর্থাৎ সত্যিকারের ইসলাম বিলুপ্ত হবে, এমনকি চিরতরে ইসলামের নাম মুছে যাবে। আর তাই তিনি ইসলামের ইমারত ও নাম রক্ষাকে যুদ্ধের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যদিও দ্বীন ও মুসলমানদের কুখ্যাত শত্রু এবং হযরতের (আঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী শত্রু মোয়াবিয়ার সাথে এ চুক্তির ফলে বনি হাশেমও ইমামের (আঃ) অনুসারীরা উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে খিমা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং অধিকার না নিয়ে খিমায় ফিরতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাই ছিল ইমাম হাসান (আঃ) এর নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেয়।

কিন্তু ইমাম হুসাইনের (আঃ) পদ্ধতি ছিল ইমাম হাসানের (আঃ) ব্যতিক্রম। তিনি (সময়ের দাবীতে) আন্দোলন করেছিলেন। কারণ তিনি দেখলেন যে, বনি উমাইয়্যার হুকুমত এমন পথে যাচ্ছে যদি এভাবে এগুতে থাকে এবং কেউ যদি তাদের কুকর্মগুলো প্রকাশ না করে দেয়, তবে তারা ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলবে এবং ইসলামের মাহাত্মকে নষ্ট করে ফেলবে। আর এ কারণেই বনি উমাইয়্যার জুলুম-অত্যাচারকে ও শক্রতাকে ইতিহাসের পাতায় লেপন করে দিয়েছেন। আর তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছেন যার ফলে নিশ্চিতরূপেই ঘটনা প্রবাহ সেদিকেই প্রবাহিত হয়েছিল যেদিকে হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ) চেয়েছিলেন।

যদি তাঁর পবিত্র সংগ্রাম ও আন্দোলন না থাকত তবে ইসলাম এমনভাবে মুছে যেত যে ইতিহাস এ দ্বীনকে বাতিল ধর্ম বলে বিবেচনা করত।

ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় শিয়ারা যে ইমাম হুসাইন (আঃ) ও তাঁর বিপ্লবের কথা প্রতিবছর বিভিন্নভাবে স্মরণ করতে আগ্রহী হয় তার কারণও এটাই। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা চায় একদিকে জুলুম ও অত্যাচারকে নির্মূল করতে, ইমাম হুসাইনের (আঃ) আন্দোলনের চেতনাকে উজ্জীবিত করতে এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জাগ্রত করতে, অপরদিকে হুসাইনী আশুরাকে স্মরণ করার ব্যাপারে ইমাম হুসাইনের (আঃ) পরের ইমামগণের (আঃ) আদেশের আনুগত্য করতে।

বিশ্বে ইসলামের মাহাত্মকে অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে আহলে বাইতগণের (আঃ) আগ্রহ ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এর জীবনালেখ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যদিও তিনি তাঁদের ঘোরতর দুশমনদের রাজত্বে বসবাস করতেন। কারণ হযরত সাজ্জাদ (আঃ) তাঁর পরিবারবর্গের উপর সীমাহীন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্বেও কারবালার বেদনা বিধূর ঘটনা এবং তাঁর বংশধর ও পিতার সাথে কৃত বনি উমাইয়্যার স্বেচ্ছাচারী আচরণের ব্যাপারে শোক প্রকাশ করতেন। তদুপরি তিনি নিরবে নির্জনে এবাদত করতেন ও মুসলিম সেনাদের বিজয়, ইসলামের সম্মান, নিরাপত্তা ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন। ইতিপূর্বেও আমরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ইসলামের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) একমাত্র অস্ত্র ছিল দোয়া। কারণ হযরত সাজ্জাদ (আঃ) দোয়ার মাধ্যমেই

তাঁর অনুসারীদেরকে শিখিয়েছিলেন যে, কিরূপে ইসলামী সেনা ও মুসলমানদের জন্য দোয়া করতে হবে।

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার সাতাশ নম্বর দোয়ায় 'সীমান্তরক্ষীদের দোয়া' নামে একটি দোয়ায় এরূপ বলেন-

> **"প্রভু হে! মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর আহলের (আঃ) প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং তাদেরকে (সীমান্ত রক্ষীদেরকে) সংখ্যায় অধিক কর। তাদের অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা দান কর। তাদের ঘাটিতে রক্ষা কর। শত্রুদের অনিষ্ট থেকে তাদের ভূখন্ডকে রক্ষা কর। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব দান কর। তাদের সুস্পষ্টভাবে পরিচালনা কর তাদের বিষয়-আশয়কে স্বীয় করুণায় পূর্ণ কর। একমাত্র তুমিই তাদের খরচাদির দায়িত্ব নাও। তাদের সহায়ক শক্তিকে অবিরামভাবে প্রেরণ কর। আর তোমার সাহায্য দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী কর। তাদেরকে ধৈর্য ও স্থৈর্য দান কর। কৌশলের শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ কর।"**

অতঃপর কাফেরদেরকে অভিশাপ দানের পর এরূপ বলতে থাকেন-

> **"হে আল্লাহ! এর মাধ্যমে ইসলামের সৈনিকদের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দাও ও মুসলমানদের শহরগুলোকে তাদের মাধ্যমে রক্ষা কর, আর তাদের ধন সম্পদ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি কর, তোমার বন্দেগী ও এবাদতের ফলে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে তাদেরকে মুখাপেক্ষীহীন কর, শত্রুদের সাথে লড়াই করা থেকে তাদেরকে মুক্তি দাও যাতে শান্তিমত তোমার এবাদতে মশগুল হতে পারে, যাতে করে পৃথিবীতে তোমার এবাদত ব্যতীত তাদের আর কোন কাজ না থাকে এবং তাদের মস্তক তোমা ব্যতীত আর কারো জন্য যেন মাটিতে রাখতে না হয়।"**

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) তাঁর এ সুদীর্ঘ ও সাহিত্যমান সমৃদ্ধ শ্রুতিমধুর দোয়ায় ইসলামের সৈন্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণণা করেছেন যাতে তারা চারিত্রিক মূল্যবোধের অধিকারী হয় এবং পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে শত্রুদের মোকাবিলা করে। হযরত (আঃ) এ দোয়ার বিষয়বস্তুতে ইসলামের সমর শিক্ষা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আর শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের সময় রণকৌশল ও সমর নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেন যে, যুদ্ধের সকল পর্যায়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে। আর তারা একমাত্র আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করবে। একথা যেন কখনোই ভুলে না যায়। অন্যান্য ইমামগণের (আঃ) নীতি তাদের সময়কালের শাসকদের মোকাবেলায় এরূপই ছিল যদিও

তাঁদেরকে সর্বদা শত্রুদের অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর ও চরম দূর্ব্যবহার মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন সত্যিকারের শাসন ভার তাদের নিকট ফিরে আসবে না তখন ধর্মীয় শিক্ষা ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণদানে আত্ম নিয়োগ করেছেন এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে সমুন্নত প্রতিষ্ঠান ও মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্মরণ করতে হবে যে, ইমামগণের (আঃ) সমসাময়িক আলাভী (আলীবংশীয়) ও অন্যান্যদের পক্ষ থেকে যে আন্দোলন ও বিপ্লবের প্রচেষ্টা হয়েছিল তা তাঁদের (আঃ) ইচ্ছা বা অনুমতি মোতাবেক হয়নি। বরং স্পষ্টতঃ এগুলো তাঁদের আদেশ ও ইচ্ছার পরিপন্থী ছিল। কারণ ইমামগণ (আঃ) ইসলামী হুকুমতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে অন্য সকলের চেয়েও অধিক এমনকি বনি আব্বাস থেকেও বেশী সচেষ্ট ছিলেন।

আমাদের এ বক্তব্যের স্বপক্ষে শিয়াদের প্রতি ইমাম মূসা ইবনে জাফরের (আঃ) ওসিয়ত তুলে ধরব যেখানে তিনি বলেন-

> **"বাদশাহদের আনুগত্য পরিহার করে নিজেদেরকে হীন করো না। যদি ঐ বাদশারা ন্যায়পরায়ণ হয় তবে তাদের টিকে থাকাটা কামনা করো; আর যদি অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হয় তবে আল্লাহর কাছে তার জন্য সংশোধন কামনা করো। কারণ তোমাদের কল্যাণ, তোমাদের বাদশাদের কল্যাণের সাথে জড়িত। আর ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দয়ালু পিতার মত। সুতরাং তোমরা তোমাদের জন্য যা পছন্দ কর তাদের জন্য তা পছন্দ কর। আর তোমাদের জন্য তোমরা যা পছন্দ কর না তা তার জন্যও পছন্দ কর না।"**[১২]

আর এটিই ছিল দেশ রক্ষার জন্য বাদশাহদের সুস্থতা কামনার জন্য আদেশ দেয়ার কারণ। কিন্তু ইদানিং কালের কোন কোন লেখক বড় ধরনের খিয়ানত করে চলেছে। তারা তাদের লেখায় শিয়াদেরকে এক গোপন ধ্বংসাত্মক দল বলে উল্লেখ করেছে। কত বড় খেয়ানত এ ধরনের লেখকরা করছে?

এটাই সঠিক যে, মুসলমান মাত্রই যারা নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আহলে বাইতের (আঃ) অনুসরণ করে তারা অত্যাচারী শত্রুদের অত্যাচারের

---

১২ 'ওয়াসায়েলুশশিয়া' -কিতাবে আমরে বিল মারুফ ওয়ানাহি আনিল মুনকার, অধ্যায় ১৭।

সম্মুখীন হয়। স্বেচ্ছাচারী, অন্যায়কারী, পাপাচারীর সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল না; তারা অত্যাচারীদেরকে (কিছু কিছু ভাল কর্মে) সহযোগিতা করলেও তাদের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দার দৃষ্টিতে তাকায়; আর বংশপরম্পরায় সর্বদা এ কৌশল অবলম্বন করে চলে। কিন্তু এ ধরনের আচরণের অর্থ এ নয় যে, শিয়াদেরকে ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারক বলে জানতে হবে। কারণ কখনোই শিয়াদের কৌশল এ নয় যে, ইসলামের নামে যে হুকুমত মানুষের উপর রাজত্ব করে চলছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে কিংবা তার বদনাম করবে। গোপনে বা প্রকাশ্যে শিয়ারা কোনভাবেই মুসলিম জনগণকে গাফেল করাটা সমীচীন মনে করে না। ঐ মুসলমানদের মাযহাব বা পথ যা-ই হোক না কেন তা শিয়াদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তারা এ পন্থা স্বীয় ইমামগণ (আঃ) থেকেই শিখেছে।

তাদের দৃষ্টিতে সকল মুসলমানের যারা আল্লাহতে বিশ্বাস ও ইসলামের নবীর (সাঃ) নবুওয়াতকে স্বীকার করে তাদের ধন সম্পদ, মালিকানা, রক্ত, ইজ্জত সবকিছু জবরদখলের হাত থেকে নিরাপদ। কোন মুসলমানের সম্পদ ভোগ করাই শিয়াদের দৃষ্টিতে বৈধ নয় তার অনুমতি ব্যতীত। কারণ মুসলমানরা ইসলামের দৃষ্টিতে পরস্পরের ভাই। সুতরাং তারা তাদের ভাইয়ের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করবে যার আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

৪২. মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

সমাজে শ্রেণী, মর্যাদা ও স্তরভিত্তিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পবিত্র ধর্ম ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দরতম আহবান হলো মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব রক্ষা। অথচ আজকের এবং পূর্বেকার সময়ের মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয়টি হল দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের দাবীর প্রতি দৃষ্টি না দেয়া এবং এ ব্যাপারে তাদের উদাসীনতা। কারণ এ ভ্রাতৃত্বের ন্যূনতম দাবী হলো ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) সেই বক্তব্য যে প্রত্যেক মুসলমানরাই যা নিজের জন্য পছন্দ করবে সে তার ভাইয়ের জন্যও যেন তা পছন্দ করে। আর যা নিজের জন্য পছন্দ করে না তা যেন তার অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করে।

আমাদেরকে এ সরল আদেশ যা আহলে বাইতের (আঃ) নির্দেশ তার উপর চিন্তা করা আবশ্যক। তখন আমরা অনুধাবন করব যে, প্রকৃতই এ আদেশ পালন করা আজকের যুগের মুসলমানদের জন্য কতটা কঠিন ও সমস্যাসংকুল; আর মুসলমানরা সত্যিই এ আদেশ থেকে কতটা দূরে! যদি এমন একটি আদেশের আনুগত্যই মুসলমানরা করত তবে কখনোই পরস্পরের উপর জুলুম করত না এবং কখনোই সীমালংঘন, চুরি, মিথ্যা, পরনিন্দা, ইত্যাদি করত না, অপবাদ দিত না বা অধিকার লংঘন করত না।

হ্যাঁ, যদি মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষেই ভ্রাতৃত্ব রক্ষার এমন একটি আদেশ পালন করত তবে নিশ্চিতই জুলুম ও শত্রুতার অবসান ঘটত। আর তখন মুসলমানরাও স্বাধীন ও প্রাধান্য সহকারে সমাজে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সৌহার্দ্য বজায় রেখে জীবন যাপন করতে পারত। ফলে বিশ্ব সমাজে যে কল্যাণময় সভ্যতা, যা প্রাক্তন দার্শনিকদের কাম্য ছিল তা বাস্তব রূপ লাভ করত। আর তখন কোন হুকুমত, বিচারালয়, কারাগার, শাস্তির বিধান কিংবা শাস্তির প্রয়োজন হত না, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীর সম্মুখে মস্তকাবনত করতে হত না। কারণ কেউই তাগুতের হাতের ক্রীড়ানক হত না। ফলে আজকের এ পৃথিবী অন্য এক পৃথিবীতে রূপ নিত যেখানে থাকত ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য ও সততা। স্বর্গের মত পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হত।

এখানে আরেকটি বিষয় আমরা সংযুক্ত করব তা হলো যদি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের নিয়ম যা ইসলাম মানুষের কাছে কামনা করেছে তা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করত তবে আমাদের জীবনের অভিধানে 'আদালত' কথাটির কোন অস্তিত্ব থাকত না। কারণ তখন আদালত এবং ন্যায়পরায়ণতা বিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকত না। বরং সেই ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের নীতিই কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সুখের জন্য যথেষ্ট হত।

কারণ কোন ব্যক্তি তখনই আদালত বা আইনের আশ্রয় নেয় যখন সমাজে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য না থাকে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, যেখানে পিতা, পুত্র ও ভাইয়ের মধ্যে ভালবাসা বিরাজ করে সেখানে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়াকে ত্যাগ করে এবং সানন্দে ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করে। স্পষ্টতঃই এমতাবস্থায় জীবনের সমস্ত সমস্যা-সংকট ভালবাসার আলোকে সমাধান হয়। ফলে আদালত ও ন্যায়নীতি কার্যকর করার কোন আবশ্যকতা থাকে না।

মানুষের সামাজিক জীবনে ভালবাসার প্রভাবের কারণ হলো প্রত্যেক মানুষই ফেতরাতগতভাবে (সৃষ্টিগত) কেবলমাত্র নিজেকে ভালবাসে। ফলে যা নিজের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয় সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব যা কিছু তার নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সে তা পছন্দ করে না। পুনরায় আমরা দেখতে পাই যে, কোন মানুষ যদি কোন কিছুকে পছন্দ না করে কিংবা তার দিকে কোন ঝোঁক তার না থাকে, তার জন্য সে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না কিংবা এর জন্য তার নিজের চাওয়া পাওয়াকে উৎসর্গ করতে পারে না কেবলমাত্র ঐ ক্ষেত্র ব্যতীত যদি ঐ বস্তুতে সে বিশ্বাসী হয়, আর তার বিশ্বাস শক্তি (যেমন- ভাল, ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার প্রতি বিশ্বাস) তার ইচ্ছা ও ঝোঁকের উপর প্রাধান্য রাখে। এমতাবস্থায় সে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রবণতার (ন্যায়, অন্যের প্রতি দয়া) কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করে।

এ বিশ্বাস যখন মানুষের মধ্যে দৃঢ়তর ও প্রভাবশালী হয় অর্থাৎ মানুষ সে সমুন্নত আত্মার অধিকারী হয় যে আত্মা অতিবস্তুগত কারণে বস্তুগত বিষয়কে অগ্রাহ্য করতে পারে, কেবলমাত্র তখনই সে আদালত (ন্যায়) ও অপরের প্রতি দয়ার শ্রেষ্ঠত্বকে উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষ কেবল তখনই এ আত্মিক সমঝোতার মুখাপেক্ষী হয়, যখন নিজের এবং অপরাপর মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করতে সে ব্যর্থ হয়। নতুবা যেমনটি উপরে আমরা আলোচনা করেছি যে 'ভালবাসা' ন্যায়পরায়ণতার স্থান দখল করে। আর ভালবাসার উপস্থিতিতে ন্যায়পরায়ণতার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

উপরোক্ত বিষয়বস্তু থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। সুতরাং তার জন্য সর্বপ্রথমেই আবশ্যক হলো অপরের জন্য নিজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী করা। যখন ব্যক্তিগত চাহিদা ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হওয়ার কারণে নিজের অভ্যন্তরে এ ভ্রাতৃত্ববোধ দুর্বল হয়ে পড়বে তখন ইসলামের আদেশসমূহ অনুসরণ করে, আদালত (ন্যায়) প্রতিষ্ঠা ও অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ়করণ করে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। যদি এক্ষেত্রে সে ব্যর্থ হয় তবে তার জন্য কেবল মুসলমান নামটিই অবশিষ্ট থাকবে। বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বেলায়াতের পতাকাতল থেকে সে নিজেকে বহিষ্কার করেছে। ফলে ইমামের

(আঃ) বক্তব্য অনুসারে (যা পরবর্তীতে আলোচনা করব) মহান আল্লাহ এ ধরনের মুসলমানকে কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন করেন না।

অধিকাংশ সময়ই মানুষের নফসের চাহিদা, কামনা তার মনুষত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ন্যায় কামনার বিশ্বাসকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে না। আর তাই ন্যায়-নীতির প্রতি বিশ্বাসকে স্বীয় অস্তিত্বে কেন্দ্রীভূত ও সুসজ্জিত করতে পারে না। ফলে নফসের চাহিদা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই যদি মানুষের মধ্যে সঠিক ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশ লাভ না করে তবে তার জন্য কোন ভাইয়ের অধিকার সংরক্ষণ করা হবে দ্বীনের শিক্ষার মধ্যে সর্বাধিক কঠিন কাজ।

এ বিষয়টির উপর লক্ষ্য রেখেই ইমাম সাদিক (আঃ) তাঁর কোন এক সাহাবী মোয়াল্লা বিন খুনাইসের প্রশ্নের জবাবে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মোয়াল্লাবিন খুনাইস ইমামকে (আঃ) ভ্রাতৃত্বের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। ইমাম (আঃ) তার অবস্থা বুঝে তাকে তার সহ্য ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দেন নি। কারণ তাঁর ভয় ছিল এ ব্যক্তি এ অধিকার সম্পর্কে জানবে কিন্তু তদানুসারে আমল করতে পারবে না।

মোয়াল্লা বিন খুনাইস বলেন ঃ ইমাম সাদিকের (আঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করলাম -এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অধিকার কী?

ইমাম সাদিক (আঃ) ঃ প্রত্যেক মুসলমানই অপর মুসলমানের উপর ৭টি আবশ্যকীয় অধিকার রাখে। এ অধিকারগুলোর প্রত্যেকটিই অপর মুসলমানের জন্যও আবশ্যক। যদি তাদের কেউ এ অধিকার হরণ করে তবে সে আল্লাহর আনুগত্য ও বেলায়াত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য কোন কল্যাণ ও দয়াই থাকবে না।

মোয়াল্লা ঃ আপনার জন্য উৎসর্গ হব, ঐ অধিকারগুলো কী কী?

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন ঃ হে মোয়াল্লা আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার ভয় হয় তুমি এ অধিকারগুলোর কথা জানবে কিন্তু আমল করবে না। ফলে তখন এগুলোকে অসার করে দিবে।

মোয়াল্লা ঃ আশাকরি আল্লাহর সাহায্যে সফল হব।

ফলে হযরত (আঃ) তখন ঐ সাতটি অধিকারের কথা বর্ণনা করলেন। বললেন-

"এদের মধ্যে প্রথমটি অন্য সবগুলোর চেয়ে সহজ। আর তা হলো অন্য সকলের জন্য তা পছন্দ কর যা নিজের জন্য পছন্দ কর। আবার অন্য সকলের জন্য তাই অপছন্দ কর যা নিজের জন্য অপছন্দ কর।"

ধিক মুসলমানদেরকে! যদি এটি সহজতম অধিকারের কথা হয়। তবে তার মুসলমানিত্বের উপর কালিমা পড়ুক যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে অথচ এ সহজ হুকুমটিই পালন করে না। অবাক ব্যাপার হলো যে, মুসলমানদের এ পশ্চাৎপদতার জন্য ইসলামকেই দায়ী করা হয়। অথচ তাদের আমলই এ পশ্চাৎপদতার কারণ।

হ্যাঁ সমস্ত পাপের দায়ভার তাদের উপরই যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে অথচ দ্বীনের সরলতম আদেশ পালন করতে রাজি না।

আমাদের ঐতিহাসিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে, নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে এবং নিজেদের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করতে আমরা ইমাম সাদিক (আঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ সাতটি অধিকারের কথা এ পুস্তিকায় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

১) তোমার মুসলমান ভাইয়ের জন্য এমন কিছুকে পছন্দ কর যা নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তার জন্য এমন কিছুকে অপছন্দ কর যা নিজের জন্য অপছন্দ কর।

২) তোমার মুসলমান ভাইকে ক্রোধান্বিত করা থেকে দূরে থাক এবং যাতে সে তুষ্ট হয় তা কর এবং তার নির্দেশের আনুগত্য কর (অবশ্য যদি অনৈসলামিক না হয়)।

৩) তোমার জান, মাল, কথা ও হস্তপদ দ্বারা তার সাহায্য কর।

৪) দেখার জন্য তার চোখ হও, চলার জন্য পথনির্দেশক হও এবং তার আয়না হও।

৫) সে যদি অভুক্ত থাকে তবে তুমি উদরপূর্তি করো না, যদি তৃষ্ণার্ত থাকে তুমি তৃষ্ণা নিবারণ করো না, যদি উলঙ্গ থাকে তবে তুমি পোশাকে সজ্জিত হয়ো না।

৬) যদি তোমার খাদেম থাকে এবং তার কোন খাদেম না থাকে, তবে তোমার জন্য ওয়াজীব হলো তার কাছে তোমার খাদেমকে তার পোষাক ধুতে, খাবার রান্না করতে এবং দস্তর মেলতে প্রেরণ করো।

৭) যদি তোমার নিকট কোন শপথ করে থাকে তবে তাকে শপথের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত কর, তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তার অসুস্থতার সময় তার সাথে সাক্ষাৎ কর, তার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। যদি জান

যে তার কোন অভাব আছে তবে তার বলার আগেই তা সমাধানে উদ্যোগী হও এবং দ্রুত তার অভাব পূরণে সচেষ্ট হও।

অতঃপর ইমাম সাদিক (আঃ) এ কথার মাধ্যমে তার বক্তব্য শেষ করেন-

"যদি এ অধিকারগুলোকে রক্ষা কর তবে তার ভালবাসার রজ্জুকে তোমার ভালবাসার রজ্জুর সাথে বন্ধন দিলে।"[১]

এ বিষয়ের উপর পবিত্র ইমামগণের (আঃ) পক্ষ থেকে অনেক বর্ণনা এসেছে। অনেকে ধারণা করেন যে, ইমামগণের (আঃ) হাদীস সমূহে ভ্রাতৃত্ব বলতে শিয়াদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে।

তবে ইমামগণ (আঃ) অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কঠোরভাবে বিরোধীদের পথের সমালোচনা করেছেন। কারণ তাঁরা তাদের বিশ্বাসকে সঠিক বলে মনে করেন না। তথাপি ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা সমস্ত মুসলমানদেরকে সমন্বিত করেছেন। আর এ কথার স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ মোয়াবিয়াহ ইবনে ওহাবের হাদীসটি পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি।[২]

তিনি বলেন ঃ ইমাম সাদিকের (আঃ) নিকট সবিনয়ে বললাম, অন্যান্য মুসলমান যাদের সাথে আমরা জীবনযাপন করি, কিন্তু তারা শিয়া নয়। তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব?

ইমাম (আঃ) বলেন ঃ তোমাদের ইমামগণ (আঃ) তাদের অসুস্থজনকে দেখতে যায়, তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করে তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী দেয়। আর তাদের আমানতের খিয়ানত করে না।

তবে শিয়াদের নিকট ইমামগণ (আঃ) যে ভ্রাতৃত্ব কামনা করেছেন, তা এই ভ্রাতৃত্বের চেয়েও উর্ধে। যেমন- 'শিয়ার সংজ্ঞা অধ্যায়ে' এ সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, আবান বিন তাগলিব নামে ইমাম সাদিকের (আঃ) এক সাহাবীর সাথে তার কথোপকথন উল্লেখ করাই এখানে যথেষ্ট।

আবান বলেন ইমাম সাদিকের (আঃ) সাথে আল্লাহর গৃহের তাওয়াফরত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আমাদের সমবিশ্বাসী একজন শিয়া আমার কাছে

---

[১] *ওয়াসায়েলুশশিয়া, কিতাবে হাজ্জ।*

[২] *উসুলে কাফী, কিতাবুল আশারা, বাবে আউয়্যাল।*

আসলেন যাতে আমি একটি কাজে তার সাথে যাই। এমতাবস্থায় আমাদেরকে ইমাম সাদিক (আঃ) একত্রে দেখলেন এবং বললেন ঃ "তোমার নিকট এ ব্যক্তির কি কোন প্রয়োজন আছে?"

আবান ঃ জী - হ্যাঁ।

ইমাম (আঃ) ঃ তাওয়াফ রেখে তার সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে এস।

আবান ঃ তাওয়াফ আমার জন্য ওয়াজিব হলেও কি তা ত্যাগ করব?

ইমাম (আঃ) ঃ হ্যাঁ।

আবান ঃ তার সাথে গেলাম এবং তার কাজ সমাধা করে ইমামের (আঃ) নিকট ফিরে এলাম। তার নিকট মুমিনের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।

ইমাম (আঃ) ঃ এ প্রশ্ন ত্যাগ কর, পুনরাবৃত্তি করো না।

কিন্তু আমি প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলাম।

তখন ইমাম (আঃ) বললেন ঃ হে আবান, স্বীয় ধন-সম্পদ কি তার সাথে ভাগাভাগি করবে? অতঃপর তিনি (আঃ) আমার দিকে তাকালেন এবং ইমামের কথা শুনার পর আমার যে অবস্থা হয়েছিল তা আমার চেহারায় লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আবান, জান কি মহান আল্লাহ ত্যাগকারীদেরকে (নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দানকারী) স্মরণ করেছেন ?[১৭৯]

আবান ঃ জী-হ্যাঁ জানি।

ইমাম (আঃ) ঃ তোমার ধন সম্পদ তার সাথে আধাআধি ভাগ করলেও ত্যাগকারীর স্থানে পৌঁছতে পারনি। কারণ তুমি তাকে তোমার উপরে স্থান দাও নি। তুমি তখনই ত্যাগীর মর্যাদা পাবে যখন তোমার ধন-সম্পদের বাকী অর্ধেকটাও দিবে।

অতএব আমি এখানে বলব যে সত্যিই আমাদের জীবন কতটা লজ্জাকর; প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে মুমিন বলাও সমীচীন নয়। কারণ আমরা কোথায় আর আমাদের ইমামগণ (আঃ) কোথায়। হ্যাঁ, মালামাল ভাগ করা সম্পর্কে আবানের যে অবস্থা হয়েছিল, যারা এ হাদীসটি পাঠ করবো তাদেরও ঠিক একই অবস্থা হবে। আর তখন এ হাদীস থেকে এমনভাবে ফিরে যাবো যেন এ হাদীসের শ্রোতা আমরা নই অন্য কেউ এবং কখনোই নিজেকে একজন দায়িত্বশীল হিসাবরক্ষকের মত বিচার ও বিবেচনাই করব না।

---

[১৭৯] *সূরা হাশর, আয়াত - ৯*

পর্ব -৫

কিয়ামত (মাআদ)

৪৩. পুনরুত্থান বা মাআদ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে নতুন করে জীবিত করবেন এবং সৎকর্মকারীকে পুরস্কৃত করবেন আর পাপীকে শাস্তি দিবেন।

খুঁটিনাটি বিষয়াদি বাদ দিলে এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমস্ত ঐশী দ্বীনসমূহ ও দার্শনিকরা একমত। মুসলমান মাত্রই কোরআনের বিশ্বাস অনুসারে এর প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে কোরআন হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

কারণ যে মহান আল্লাহ ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এ রেসালাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াত ও সত্য দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন; তার পক্ষে এ পবিত্র কোরআনে যা কিছু এসেছে তাতেও বিশ্বাস করা ছাড়া গতন্তর নেই। যেমন- পবিত্র কোরআনে পুনরুত্থান দিবস, সওয়াব ও শাস্তি, বেহেশত ও এর নেয়ামতসমূহ এবং দোযখ ও এর অগ্নি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে। সুতরাং এগুলোতে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

পবিত্র কোরআনে প্রায় এক হাজারের মত আয়াতে সুস্পষ্টরূপে পুনরুত্থান ও মানুষকে দ্বিতীয়বারের মত জীবিত করার ব্যাপারে ইংগিত দেয়া হয়েছে। অতএব যখন কেউ এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করে তখন এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে রাসূলের (সাঃ) রেসালাতের প্রতি, কিংবা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। আরও উপরে উঠে বলা যায় যে, সে সমস্ত ঐশী দ্বীনের মূলে এবং এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

৪৪. দৈহিক পুনরুত্থান সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ঃ

শীয়ারা মূল পুনরুত্থানে বিশ্বাসের পাশাপাশি দৈহিক পুনরুত্থানেও বিশ্বাস করে এবং একেও দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বলে মনে করে। যেমন- কোরআনের একটি আয়াতে আমরা পড়ি-

> **"ওহে! মানুষ কি মনে করে যে আমরা কিয়ামত দিবসে তার হাড়গুলোকে একত্র করব না? না! এ ধারণা ঠিক নয়। বরং আমরা তার আংগুলের অগ্রভাগগুলোকেও আগের মত তৈরী করতে সক্ষম।"**
> (সূরা কিয়ামত - ৩)

অনুরূপ আমরা অপর একটি আয়াতে পড়ি-

> **"যদি অস্বীকারকারীদের ধারণায় তুমি আশ্চর্যান্বিত হও, তবে তার চেয়ে আশ্চর্যজনক হলো তাদের বক্তব্য যারা বলে- মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় কি নতুনভাবে সৃষ্টি হব?** (সূরা রাদ - ৫)

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

> **"ওহে! আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম? না বরং এ অস্বীকারকারীরা নতুন করে সৃষ্টি (পরবর্তী জীবনে) সম্পর্কে সন্দেহ করে।"** (সূরা ক্বাফ - ১৫)

সংক্ষেপে দৈহিক পুনরুত্থান হলো- মানুষ কিয়ামত দিবসে জীবিত হবে এবং তার দেহ যা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গলে গিয়েছিল পুনরায় সে একই আকৃতিতে ও অবয়বে ফিরে আসবে।

পবিত্র কোরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তার অধিক বিস্তারিত বর্ণনায় বিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই। বরং যা বিশ্বাস করা জরুরী তা হলো মূল মাআদ বা পুনরুত্থান ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়। যেমন- হিসাব, সিরাত, মিজান, বেহেশত, দোযখ, সওয়াব ও শাস্তি। যতটুকু কোরআন বর্ণনা করেছে তা-ই যথেষ্ট।

এ বিষয়ের উপর সমস্ত খুটিনাটি যা পন্ডিত ও চিন্তাবিদ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জ্ঞাতব্য নয় তা সূক্ষ্মভাবে সনাক্তকরণ আবশ্যক নয়। যেমন- ঠিক এদেহই ফিরে আসবে না-কি এর সদৃশ কোন দেহ? আমাদের রূহ আমাদের শরীরের মতই ধ্বংস হবে, না-কি অটুট থাকবে এবং কিয়ামত দিবসে দেহের সাথে সমন্বিত হবে? পুনরুত্থান ও হাশর কি কেবল মানুষের

জন্যই না-কি সমস্ত প্রাণীরই হাশর হবে? শরীরের জীবিত হওয়া কি পর্যায়ক্রমিক হবে, না-কি একবারেই হবে?[১]

উদাহরণতঃ কেবল বেহেশত ও দোযখের বিশ্বাস রাখা জরুরী। কিন্তু বেহেশত ও দোযখ এখন আছে কি-না, কিংবা আকাশে আছে, না-কি পৃথিবীতে আছে অথবা বেহেশত আকাশে এবং দোযখ পৃথিবীতে -এগুলো বিশ্বাস করা জরুরী নয়।

অনুরূপভাবে মূল মিজানের (আমলের পরিমাপক) প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। কিন্তু মিজান কি অবস্তুগত নিক্তি, না-কি অন্যান্য নিক্তির মত দু'হাতল বিশিষ্ট- এগুলো বিশ্বাস করা জরুরী না। অনুরূপ জানা দরকার নেই যে, পুল সিরাত কি মসৃন ও সরু বস্তুগত পথ (তরবারী থেকে ধারালো এবং চুল থেকে সরু), না-কি তা অবস্তুগত দৃঢ়তা এবং সফলতার পথ।[২]

সংক্ষেপে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য এ খুটিনাটিগুলোতে বিশ্বাস করা জরুরী নয়। বরং পুনরুত্থান সম্পর্কে সরল ও অনুভবযোগ্য বিশ্বাস সেটিই যা দ্বীন ইসলাম বলেছে। যদি কোন ব্যক্তি কোরআন যা বলেছে তার চেয়ে বেশী জানতে চায় যাতে অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় তুষ্টকারী অভিজ্ঞতালব্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল উপস্থাপন করতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে কষ্ট-ক্লেশে ফেলেছে এবং যে আলোচনার কোন শেষ নেই এমন সমস্যা সংকুল আলোচনায় নিজেদেরকে মশগুল করেছে।

ইসলামে এমন কোন নির্দেশ নেই যা মুসলমানদেরকে কালাম শাস্ত্রেরও দর্শনের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আহবান করেছে। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনও আমাদেরকে ঐ সকল গ্রন্থে যা কিছু এসেছে তার সবকিছুই জানতে আহবান করে না। কারণ এ বক্তব্যগুলোর সবই তার্কিকদের চিন্তা থেকে উৎসারিত এবং এগুলোতে সময় নষ্ট করা ও বুদ্ধি নষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোন উপকারিতা নেই।

এ ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে (যা মস্তিস্কে এসে ভীড় জমায়) এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের দৃষ্টির আড়ালের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কিংবা মানুষ তা করতে অক্ষম। তাছাড়া আমরা জানি যে, সর্বজ্ঞ ও মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহ

---

[১] *যারা এ ব্যাপারে জানতে আগ্রহী তারা "এলমে রূহে জাদীদ" গ্রন্থ পাঠ করুন।*

[২] *কাশেফুল গিতা - পৃঃ ৫*

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামত, পুনরুত্থান দিবস এবং হাশর-নশর সত্য।

মানুষ তাতে সক্ষম নয় যে অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতিতে যা অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতির আওতায় নয় তা অনুধাবন করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর মাধ্যমে এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে অন্য এক জগতে স্থানান্তরিত হয়। অতএব মানুষ কিরূপে সীমাবদ্ধ চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বয়ং কিয়ামতকে প্রতিপাদন বা অস্বীকার করতে পারে?

সুতরাং মানুষ তার এ সীমাবদ্ধ চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুনরুত্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই যেখানে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। সেখানে এর খুটিনাটি বিষয়কে অনুধাবনের কথাতো বলাই বাহুল্য।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যে সকল বিষয়ে তারা অভ্যস্ত নয় এবং যা যা তার জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার সীমানা বর্হিভূত সেগুলোকে তার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়। যেমন- সে ব্যক্তির মত যে, হাশর ও নশরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া হাড়কে এমনভাবে চাপ দিল যে এর গুড়াগুলো বাতাসে উড়ে গেল। আর তখন সে বলল-

> **"কে এই গলিত বিগলিত হাড়গুলোকে পুনরায় (মানুষের মত করে) জীবিত করবে?"** (সূরা ইয়াসিন - ৭৮)

তবে এ ব্যাপারে তার আশ্চর্য হওয়ার কারণ হলো সে এমন কোন মৃতকে দেখেনি যে পঁচে গলে যাওয়ার পর পুনরায় পূর্বের মত জীবিত হয়েছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তার প্রথম সৃষ্টির কথা ভুলে গিয়েছে- কিরূপে তাকে 'নাই' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ সৃষ্টির পূর্বে সে আসমান ও জমিনে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। অতঃপর তাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

> **"মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে নোতফা (বীর্য বা শুক্রানু) থেকে সৃষ্টি করেছি? এখন তারা (কৃতজ্ঞতা ও নম্রতার পরিবর্তে) প্রকাশ্যে আমাদের (ক্ষমতার মোকাবিলায়) শত্রুতা করে এবং আমার সাথে সাদৃশ্য করে, কিন্তু তার সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বিস্মৃত হয়ে।"**
> (সুরা ইয়াসিন ৭৭-৭৮)

কোরআন এ ধরনের আপনভোলা ও উদাসীন লোকদেরকে বলে-

> **"যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন। কারণ তিনি সকল প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেই সম্যক অবগত।" (সূরা ইয়াসিন - ৭৯)**

সুতরাং কিয়ামতকে অস্বীকার করে এমন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আমরাও বলব- তুমিতো সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, তাঁর ক্ষমতা এবং মহানবীর (সাঃ) রেসালাত ও তাঁর কথার সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করেছ। অপরদিকে যখন তোমার জ্ঞান ও অনুভূতি সৃষ্টির রহস্যকে অনুধাবন করতে অপারগ এবং তুমি কিরূপে বিকাশ লাভ করেছ তাও জান না, কিরূপে ইচছা, অনুভূতি ও বুদ্ধিশুণ্য বীর্য থেকে অস্তিত্বে এসেছ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কণিকাগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে এক যথাযথ মানুষে পরিণত হয়েছ এবং সর্বদিক থেকে প্রস্তুত, বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন, অনুভূতিশীল হিসেবে প্রকাশ লাভ করেছ তখন কেন এ ব্যাপারে আশ্চার্যান্বিত হও যে, মৃত্যুর পরেও বিগলিত হওয়ার পর পূনরায় জীবিত হবে?

যদি তুমি চাও বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মৃতদেরকে জীবিত হওয়ার ব্যাপারটি অনুধাবন করবে, তবে তা সম্ভব নয়। বরং তোমার জন্য কেবল একটি পথই খোলা- আর তা হলো এই যে, তোমাকে এ কিয়ামত বা পুনরুত্থান স্বীকার করতে হবে যে সম্পর্কে বিশ্বের সর্বজ্ঞ ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা, পবিত্র কোরআনে সংবাদ দিয়েছেন, আর জেনে রাখতে হবে যে, এর রহস্য উদঘাটনের জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন কোন ফল পাবে না। কারণ তোমার জ্ঞান ও অনুভূতি এক্ষেত্রে অক্ষম। সুতরাং যে কোন পদক্ষেপই নাও না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং সীমাহীন মরুভূমিতে পথচলার মত হবে কিংবা অন্ধকারে চোখ খোলার মত হবে। কারণ মানুষ যদিও সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে এতটা অগ্রগতি অর্জন করছে, বিদ্যুৎ, রাডার ইত্যাদি ব্যবহার করছে, পরমাণুকে বিভাজন করছে, (যদিও বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করছে এবং অনেকেই সেটিকে উপহাস করছে) তথাপি সে বিদ্যুৎ ও পরমাণুর স্বরূপ উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি সে এগুলোর কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে (পরিপূর্ণরূপে) অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় সে কিরূপে সে সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করতে সমর্থ হবে? তদুপরি, সে কিয়ামত ও পুনরুত্থানের রহস্য উদঘাটন করতে চায়?

অতএব উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে বলা যায় ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর, মানুষের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত কাজ হলো নফসের কামনাকে অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকা। আর এমন কর্মকান্ডে মশগুল হওয়া যা তার ইহ ও পরকালীন কল্যাণে আসবে এবং মহান আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা ও স্থানকে সমুন্নত করবে। আর এমন সকল বিষয় সম্পর্কে তাকে চিন্তা করা উচিৎ যা তাকে এ পথে সাহায্য করবে। আরও চিন্তা করা উচিৎ যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে কিরূপ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, যেমন- কবর আজাব এবং সর্বজ্ঞ ও বিশ্বাধিপতি মহান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পর হিসেব দান করা ইত্যাদি; যাতে সে দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে যার বর্ণনায় পবিত্র কোরআন বলে-

"কারো জায়গায় অন্য কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারো কোন শাফাআত ও বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।?" (সূরা বাকারা - ৪৮)

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"